প্রাণ ধুক্‌পুক্‌ করে না গণেশের।

বিস্ময় আর উত্তেজনা অভিভূত করে রাখে তাকে, আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়তে বুঝি খেয়ালও হয় না তার। বিশ-বাইশ বছর বয়সের জীবনে এমন কাণ্ড সে চোখে দেখেনি, মনেও ভাবেনি। এত বিরাট, এমন মারাত্মক ঘটনা, এত মানুষকে নিয়ে। এ তার ধারণায় আসে না, বোধগম্য হয় না। তবু সবই যেন সে বুঝতে পারছে, অনুভব করছে, এমনি ভাবে চেতনাকে তার গ্রাস করে ফেলেছে রাজপথের জনতা আর পুলিশের কাণ্ড। সেই যেন ভিড় হয়ে গেছে নিজে। ভিড়ে সে আট্‌কা পড়েনি,

বন্ধ দোকানটার কোণে যেখানে সে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে পাশের সরু গলিটার মধ্যে সহজেই ঢুকে পড়তে পারে যখন ইচ্ছা হবে তার এখান থেকে সরে যেতে। কিন্তু যাবে কি, সে বাঁধা পড়ে গেছে আপনিই। জনতার গর্জনে, গুলির আওয়াজে, বুকে আলোড়ন উঠছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে শিরার রক্ত। 'ভয় ভাবনা চাপা পড়ে গেছে আড়ালে। ভয়ে নয়, নিজেকে বাঁচাবার হিসাব কষে নয়, হাঙ্গামা থেকে তফাতে সরে যেতে হয় এই অভ্যস্ত ধারণাটি শুধু একটু তাগিদ দিচ্ছে পালিয়ে যাবার। কিন্তু সে জলো তাগিদ। হাঙ্গামা যে এমন অনড় অটল ধীর স্থির হয়, বন্দুকধারিদের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ এদিক ওদিক এলোমেলো ছুটোছুটি করে না, এ তার ধারণায় আসে না। এ কেমন গণ্ডগোল যেখান থেকে কেউ পালায় না। তাই, চলে যাবার কথা মনে হয়, তার পা কিন্তু অচল। কেউ না পালালে সে পালাবে কেমন করে।

তা ছাড়া, মনে তার তীব্র অসন্তোষ, গভীর কৌতূহল। এমন অঘটন ঘটছে কেন, থেমে থাকছে কেন তার গাঁয়ের পাশের হলদি নদীতে পূর্ণিমার কোটালের জোয়ার? দেড় ক্রোশ তফাতের সমুদ্র থেকে উন্মত্ত কোলাহলে ছুটে আসছে যে মানুষ-সমান উঁচু জলের তোড়, তা তো থামে না, কিছু তো ঠেকাতে পারে না তাকে। কত পূর্ণিমা তিথিতে অনেক রাতে চুপি-চুপি ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে মা-বাবাকে না জাগিয়ে,

ড়য়ে থেকেছে ভাঁটার মরা নদীর ধারে কোটালের জোয়ারের মাঙ্গকর আবির্ভাবের জন্য।

দিনে ভাঁটার নদীর কাদায় শুয়ে কত কুমীর রোদ পোহায়। খে মনে হয়, কত যেন নিরীহ ভাল মানুষ জীব। অল্প লে হঠাৎ তীরের মত কি যে তীব্র বেগে জলকে লম্বা রেখায় টে হাঙ্গর গিয়ে শিকার ধরে। কাদা-জলে লাফায় কত দ্ভুত রকমের মাছ। কেমন তখন বিষন্ন হয়ে যায় গণেশের ন। আহা, দুঃখী নদী গো, হাঙ্গর কুমীর মাছ গিলে কত ীব, তবু যেন জীবনের স্পন্দন নেই, ডাইনে বাঁয়ে যত দূর তাকাও ত দূর তক। এই নদীতে প্রাণ আসবে, স্বয়ং পাগলা শিব-াকুর যেন আসছেন নাচতে নাচতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে সাদা ফেনার মুকুট পরে, তেমনি ভাবে আসবে প্রাণের জোয়ার। ণেশের প্রাণেও আনন্দ এত, যা মাপা যায় না।

সেই অভ্যস্ত, পরিচিত, অতি ভয়ানক, অতি উন্মাদনায় কোটালের জোয়ার যদি বা মনে ধেয়ে এল গর্জন করে গাঁ ছেড়ে আসবার এতদিন পরে সহরের পথে সে জোয়ার থেমে গেল, বসে পড়ল ফুটপাথে পিচের পথে। এ কেমন গতিহীন গর্জন, সাদা ফেনার বদলে এ কেমন কালো চুলের ঢেউ।

গুলি লেগেছে না কি? না লাঠি?

ওসমান জিজ্ঞেস করে গণেশকে দ্বিধা-[illegible] স্বরে, গভীর সমবেদনায়। দোকানের কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে ছেলেটা, ঠিক কোথা থেকে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে
করে দিচ্ছে গায়ের ময়লা/ছেঁড়া ফতুয়াটা ঠিক বোঝা যা।
গুলি যদি লেগেই থাকে, যেখানেই লেগে থাক, দাঁড়িয়ে
কি করে ছেলেটা, ফতুয়ার বুকের দিকটা যখন চুপসে
রক্তে? চোখের চাউনিটা অদ্ভুত। মরা মানুষ যেন
উঠে তাকিয়ে আছে বিহ্বলের মত। কুলি মজুরিই
করে। মোটটা নামিয়ে রেখেছে।

'অাঁ? কি জানি বাবু।' অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শোনায় গ
গলা, 'এরা এগোবে না বাবু?'

বাবু! খচ করে একটু আঁচড় লাগে ওসমানের
কালি-ঝুলি মাখা এই হাফসার্ট পরণে, রংচটা সুতোওঠা
প্যাণ্ট, পায়ে জুতো নেই, দাড়ি কামায়নি সাত দিন।
তাকে বাবু বলে ছেলেটা। ঘৃণ্য বাবু বলে গাল দেয়! ট্রা
কাজ ছেড়ে দেবার চলতি আপশোষটা আরেকবার নাড়া
ওসমানের। এ আপশোষ তেজী হয়েছে ওসমানের
ধর্ম্মঘটের সাফল্যের পর। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসেও কেউ
দিন তাকে বাবু বলে অপমান করেনি।

তবে হ্যাঁ, এ ছেলেটা মুটে-মজুরি করে। গাঁ
এসেছে বোধ হয় নেহাৎ পেটের খিদের তাড়নায়। ভিখ
আর মুটে-মজুর ছাড়া সবাইকে বাবু বলা অভ্যাস হয়ে গে

'ওরা বসে দাঁড়িয়ে থাকবে বাবু? এগোবে না?'

এবার ক্ষীণ শোনায় গণেশের গলা, শ্লেষ্মায় আটকানো কাশির রুগীর গলার মত, রক্তে আটকানো যক্ষ্মা রুগীর গলারও মত।

'এগোবে না ত কি?' ওসমান মৃদু হেসে বলে, নিঃসংশয়ে। পিছু হটে ছত্রখান হয়ে পালিয়ে যখন যায়নি সবাই, লাইন ক্লিয়ার না পাওয়া ইঞ্জিনের মত শুধু নিয়ম আর ভদ্রতার খাতিরে থেমে থেমে ফুঁসছে এগিয়ে যাবার অধীরতায়, তখন এগোবে না ত কি। এগোবার কল টিপলেই এগোবে।

'তবে কি না---' গণেশ জোরে বলবার চেষ্টা করে জড়িয়ে জড়িয়ে। দোকানের বিজ্ঞাপন আঁটা দেয়ালের গায়ে পিঠ ঘষড়ে সে নেমে যায় খানিকটা হাঁটু বেঁকে। পিঠ কুঁজো হয়ে মাথাটা ঝুলে পড়ে। যে বাড়ীর কোণে ছোট একখানি ঘর তার পিছনে হেলান দেবার দোকান, সেই বাড়ীরই উঁচু ভিতের বাঁকানো একটু খাঁজে না আটকালে সে হয় তো তখনি ফুটপাতে আশ্রয় নিত, আরও যে মিনিটখানেক পড়ে না গিয়ে আধ-খাড়া রইল তা আর ঘটত না।

'কি বলছ?'

ওসমান ঝুঁকে গণেশের মুখের যত কাছে সম্ভব মুখ নিয়ে যায়। শুনতে পায় শুধু গলার ঘর্ঘর ধ্বনি। সামনের লোকেরা ঘরে দাঁড়িয়েছে, জমাট বাঁধা জনতাকেও চাপ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে

দিয়েছে হাতখানেক, যায়গা দিয়েছে গণেশকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার।

রক্তমাখা জামাটা দু'হাতে একেবারেই ছিঁড়ে ফেলে ওসমান। বুকে কোথাও ক্ষতের চিহ্ন নেই, একটাও ফুটো নেই। এক ফোঁটা রক্ত বেরোয়নি বুক থেকে ছেলেটার। জামাটা তবে ভিজল কি করে রক্তে?

না, বাঁ গালটাতেও রক্তের চাপড়া পড়েছে বটে ছেলেটার। ঝাঁকড়া চুলের ভেতর থেকে রক্তস্রাব হচ্ছে। এক রাশি ঘন রুক্ষ চুলের আড়ালে আঘাতটা লুকিয়ে আছে।

একে বাঁচানো উচিত, ওসমান ভাবে।

তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয় তো বাঁচতে পারে। হয়তো। ওসমান কি করে জানবে কি রকম আঘাত ওর লেগেছে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচবে কিনা শেষ পর্যন্ত ঠিক জানে না বটে ওসমান, কিন্তু এটা সে ভাল করেই জানে, হাসপাতালে পৌঁছতে দেরী হলে নিশ্চয় বাঁচবে না।

বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে ওকে। তাকেই করতে হবে। খুন যখন বেরিয়ে আসছে গলগল করে, তাকেই ছোক্‌রা বারবার জিগ্‌গেস করেছে, ওরা এগোবে না বাবু? শহীদ হবার আগে এই একটা জবাব শুধু চেয়েছে ছেলেটা তার কাছে। একে বাঁচাবার চেষ্টা না করলে চলে?

চিহ্ন ::

এম্বুলেন্স? মোড়ের মাথায় এম্বুলেন্স আছে, কজনে ধরাধরি করে তাড়াতাড়ি ওকে নিয়েও যাওয়া যায় ওখানে, জমাট বাঁধা ভিড় ফাঁক হয়ে গিয়ে তাদের পথ দেবে, ওসমান জানে। কিন্তু ওই এম্বুলেন্সের ব্যাপারও সে জানে। বিশেষতঃ এ ছোক্‌রা কুলির ছেলে। এম্বুলেন্সের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করতে করতে এ খতম হয়ে যাবে। না, ও এম্বুলেন্সের ভরসা নেই ওসমানের।

রাস্তার ধারে দাঁড় করানো পুরাণো খোলা লরীটা আট্‌কা পড়ে গিয়েছিল শোভাযাত্রায়। ওসমান উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকে, 'লরী কার?'

জিওনলাল বলে, 'আমার আছে।'

'ইস্‌কো জানের দায়িক তুমি, খোদা কসম। জোরসে লে চলো হাসপাতাল।'

এক মুহূর্ত্তই ইতস্ততঃ করে জিওনলাল বলে, 'লে আও।'

ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিয়ে ষ্টিয়ারিং ধরে বসে ততক্ষণে কয়েক জনের সাহায্যে ওসমান লরীতে উঠে গণেশকে কোলে নিয়ে বসেছে।

মানুষের মধ্যে আট্‌কা পড়েছিল লরীটা, দেখতে দেখতে এবার পথ সৃষ্টি হয়ে যায় তার জন্য, হুস করে লরী ঢুকে যায় পাশের গলিতে।

চিহ্ন ঃঃ

সভায় যাবার ইচ্ছা আমার ছিল না, শোভাযাত্রায় যোগ দিতে আমি চাইনি। এটা তবে কি রকম ব্যাপার হল? হেমন্ত ভাবে।

নিজের ব্যবহার বড় আশ্চর্য্য মনে হয় হেমন্তের নিজেরই কাছে, বিশেষতঃ নিজের মনের চাল-চলন। সভায় গিয়ে দাঁড়াবার খানিক পরেই মন যেন বিনা দ্বিধায় বিনা তর্কে কোন বিচার-বিবেচনা হিসাব-নিকাশ না করেই বাতিল করে দিল এত দিনকার কঠোর ভাবে মেনে চলা রীতিনীতি। এত দিন ধরে যা সে যে-ভাবে ভেবেছে আজ যেন ও-ভাবে ও-সব ভাববার দরকারটাই শেষ হয়ে গেছে একেবারে। একান্ত পালনীয় বলে যা সে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে এত দিন, আজ তার বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে বলে বিচলিত হবার কিছু নেই, ক্ষোভের কারণ নেই।

এত সহজে কি করে মত বদলায় মানুষের, তার? এমন আচমকা কি করে নতুন মত মেনে চলা এমন স্বাভাবিক মনে হয় মানুষের, তার? অথবা আজকের এ ব্যাপারে মতামতের প্রশ্ন নেই, প্রতিদিনকার সাধারণ জীবনে যে মতামত নিয়ম-কানুন খাড়া করে চলা যায়, এই বিশেষ অবস্থায় সে সব বর্জন করে চলাই কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়ায়? ধাঁধাঁ লেগে যায় হেমন্তের এ সব চিন্তায়।

না, রাজনীতি বাজে নয়, তুচ্ছ নয় হেমন্তের কাছে। অত অন্ধকার নয় তার মন। বিশেষত এদেশের রাজনীতি স্বাধীনতার

সংগ্রাম, বংশানুক্রমিক সুদীর্ঘ সংগ্রাম। কিন্তু সব কিছুরই যেমন সময় আছে, বয়স আছে মানুষের জীবনে, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবারও সময় আছে, বয়স আছে। অতি ভাল কাজও অসময়ে করতে চাইলে অকাজ হয়ে দাঁড়ায়, ফল হয় খারাপ। নিজের যা কর্ত্তব্য সেটুকু ভালভাবে পালন করতে পারাই সার্থকতার রীতিনীতি, নিয়ম।

সভার একপাশে যায়গা নিয়ে দাঁড়াবার সময়ও বিশ্বাস তার দৃঢ় ছিল,---রাজনৈতিক সভায় যোগ দেওয়া কোন ছাত্রের উচিত নয়। ছাত্র-জীবনে রাজনীতির স্থান নেই। লেখা-পড়া শিখে মানুষ হবার সময় হাতে-কলমে রাজনীতি চর্চ্চা করা তাস পিটে আড্ডা দিয়ে হৈ চৈ করে সময় আর এনার্জি নষ্ট করার মতই অন্যায়। ছাত্রের কাছে রাজনীতি শুধু অধ্যয়নের বিষয়, কোলাহল মত্ততা দলাদলি সংঘাত থেকে দূরে থেকে শান্ত সমাহিত চিত্তে তাপসের সংযত শোভন জীবন যাপন করবে ছাত্র।

সভায় তবে সে কেন থাকে, কি করে থাকে? শোভা-যাত্রায় যোগ দেয়, ফুটপাতে বসে পড়ে যতক্ষণ দরকার বসে থাকার সঙ্কল্প নিয়ে? মত তার বদলায়নি, বিশ্বাস শিথিল হয়নি। জোরের সঙ্গে স্পষ্ট ভাবে শুধু মনে হয়েছে, আজ এই বিশেষ অবস্থায় তার মত বা বিশ্বাসের কোন প্রশ্ন আসে না, ও-সব বিষয় বিবেচনা করার সময় এটা নয়। অন্য সময় যত খুসী

নিষ্ঠার সঙ্গে ও-সবের মর্য্যাদা রেখে চললেই হবে, এখন নয়। এখন যা করা উচিত, তার মত হাজার হাজার ছাত্রের সঙ্গে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ মিলে যা করছে, তাকেও তাই করতে হবে। তাতে সংশয়ের কিছু নেই, তর্ক নেই।

একটু কৌতূহলের বশে হেমন্ত সভায় দাঁড়িয়েছিল। এত সীমাহীন দলাদলি, এমন কুৎসিত আত্মকলহ যাদের মধ্যে, তারা কি করে একসাথে মিশে সভা করে একটু দেখবে। ছেলেদের বড় একটা অংশ গোল্লায় গেছে। শুধু হৈ-চৈ, গুণ্ডামি, সিগারেট-টানা, মেয়েদের পেছনে লাগা, শেষে পরীক্ষার হলে চুরি-চামারি, গার্ডের সঙ্গে মারামারি, গার্ডকে খুন করা। এ অধঃপতনের কারণ সে জানে। রাজনৈতিক মত্ততা এই নৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ী। তার মতকেই সমর্থন করে ছেলেদের মধ্যে এই মারাত্মক দুর্নীতির প্রসার---নিজের কাজকে অবহেলা করে অকাজ নিয়ে মেতে থাকলে এরকম শৈথিল্য আসতে বাধ্য, ছাত্রই হোক আর যাই হোক তাদের মধ্যে। নিয়মানুবর্ত্তিতাকে চুলোয় পাঠিয়ে, লেখা-পড়া তাকে তুলে হৈ-চৈ হাঙ্গামা নিয়ে মেতে থাকার জন্য রাজনীতি চর্চ্চার চেয়ে ভাল ছুতো আর কি হতে পারে?

উচ্ছৃঙ্খলায় কি মিল হয়? কি মানে সে মিলের?

শীতের তাজা রোদে উজ্জ্বল দিন। কি তাজা দেখাচ্ছে এদের মুখগুলি, কত উজ্জ্বল সকলের দৃষ্টি। দুঃখ বোধ করেছিল

হেমন্ত। অপচয়ে ক্ষয়ের ছাপ পড়ে না, ভ্রান্ত আদর্শ কাবু করে না, এমন যে অফুরন্ত তরুণ প্রাণশক্তি আর বিশ্বাস, তার কি শোচনীয় অপব্যবহার! একবার ভেবেছিল হেমন্ত, চলে যায়। কি হবে এদের গরম গরম চীৎকার শুনে? আর যদি মতভেদ ঘটে, বাদানুবাদ হয়, হাতাহাতি মারামারি আরম্ভ হয়ে যায়, আরও তখন বেশী খারাপ হয়ে যাবে মনটা নিজের চোখে সব দেখে। তার চেয়ে কাল খবরের কাগজে পড়লেই হবে কি হল না হল সভায়।

কিন্তু চলে যেতে সে পারেনি।

প্রদীপ্ত মুখগুলি, নির্ভীক চোখগুলি, আশে-পাশের ছাড়া-ছাড়া কথা ও আলোচনার টুকরোগুলি, সমস্বরে শ্লোগান উচচারণের ধ্বনিগুলি আর অনুভূতির এক অদ্ভুত দুরন্তপণা তাকে আটকে রেখেছে।

বক্তৃতা যারা দিয়েছে তাদের মধ্যে তিন জন হেমন্তের চেনা। বুকের মধ্যে তোলপাড় করেছে তার। খানিক বক্তৃতা শুনে বাকীটা এই তিনজন চেনা ছাত্রের নতুন পরিচয় আবিষ্কার করার বিস্ময় ও উত্তেজনায়। চোখে দেখে কানে শুনেও অবিশ্বাস্য অসম্ভব মনে হয় এখানে ওদের উপস্থিতি, আন্দোলনে অংশ গ্রহণ! বিশেষ ভাবে শুদ্ধসত্বের---যার সঙ্গে পাল্লা দিতে হওয়ার গত পরীক্ষায় সে অনার্সে প্রথম স্থানটি পায়নি বলে আজও তার বুকে ক্ষোভ জমা হয়ে আছে! আনোয়ার

ও শিবনাথের পরীক্ষার ফলও তো কত ভাল ছেলের বুকে ঈর্ষার আগুন জেলে দিয়েছে। ওরা রাজনীতিও করে আবার শান্তশিষ্ট ভদ্র হয়ে থাকে, ছাত্রজীবনের সাংস্কৃতিক সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে, পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল করে কি করে ?

মাকে মনে পড়ে হেমন্তের। সীতাকেও। এইখানে এভাবে তাকে পুলিশের লাঠি ও গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে বসে থাকতে দেখলে মার মুখের ভাব কি রকম হত ভাবতে গিয়ে কল্পনায় যেন কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায় না মার মুখখানা, বড় বড় চোখের আতঙ্ক-বিহ্বলতার আড়ালে মুখের বাকী অংশ ঝাপসা হয়ে থাকে। আজ এত দিন পরে মার কাছে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল---একেবারে চরম ভাবে। রাজনীতি মাথায় ঢুকলে পড়াশোনায় তার অবহেলা আসবে, সে মানুষ হবে না, হয় তো জেলেও যেতে হবে তাকে ছ'মাস এক বছরের জন্য, এই হল মার ভয়, দুর্ভাবনার সীমা। মরণের সামনে সে যে মুখোমুখি দাঁড়াবে কোন দিন আজকের মত, একথা মা বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি কোন কালে। রাজনৈতিক সভায় পর্য্যন্ত কখনো যাবে না বলে যে ছেলে কথা দিয়েছে আর সে কথা পালন করে এসেছে এত দিন অক্ষরে অক্ষরে, তার হঠাৎ এমন মতিভ্রম হবে যে সভা থেকে শোভাযাত্রার যোগ দিয়েও যথেষ্ট হয়েছে মনে না করে হাঙ্গামার মধ্যে খুন হবার

তাড়াতাড়ি সিগারেটটা ফেলে দিয়েছিস। নইলে সিগারেট খাওয়া দোষের নয় বুঝে তুই যদি খাস হেমা, খেতে ইচ্ছা হলে--'

আঁচল দিয়ে চোখের জলের সঙ্গে মুখের হাসিটুকুও যেন মা মুছে নিয়েছিলেন।

'এখন আর ভাবনার কিছু নেই তো?'

'এমনি করেই কিন্তু হ্যাবিট জন্মায় হেমা, ইচ্ছা না থাকলেও।'

মার কথা ভেবে মায়া বোধ করে হেমন্ত, কিন্তু কেমন এক বৈরাগ্য মিশে সে মায়াবোধের ব্যাকুলতা আর উদ্বেগকে নিরস্ত করেছে এখন। মাকে মনে হচ্ছে দূরে, বহু দূরে। এখান থেকে ট্রামে বাড়ী যেতে সময় লাগে মোটে মিনিট পনের, সেখানে মা হয় তো আকুল হয়ে আছেন তার জন্য, কিন্তু বিরাট এক বাস্তব সত্য যেন দুস্তর ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে রাজপথের এই শক্ত ফুটপাথ আর মায়ের অগাধ স্নেহ অসীম শুভ কামনা অনন্ত দুর্ভাবনা ভরা সেই নীড়ের মাঝখানে, শান্তি আর যুদ্ধের সময়কার জগতের মত অতি ঘনিষ্ঠ অথচ অসীম দূরত্ব ও পার্থক্যের ব্যবধান।

এখন কি যেতে পারে না সে বাড়ী ফিরে? একেবারে প্রথম দিনের পক্ষে এই কি যথেষ্ট হয়নি, আজ আর নাই বা এগোল? নিজের মনেই মাথা নাড়ে হেমন্ত।

একা উঠে চলে যাওয়া যায় না একার প্রয়োজনে। না এলে ভিন্ন কথা ছিল, এখন আর ফিরে যাওয়া চলে না। তার না হয় মার জন্য অবিলম্বে বাড়ী ফেরা একান্ত দরকার, একা হলে হারও না হয় সে মেনে নিত সেজন্য নিজের কাছে অপমানে নিজে কালো হয়ে গিয়ে, কিন্তু এদের সকলকে হার মানাবার অধিকার তো তার নেই। সে উঠে গেলে আর একজন দু'জনও যদি তার অনুসরণ করে?

সীতাকেও মনে পড়ে হেমন্তের।

মার মতই তাকেও মনে হয় বহু দূর, কুয়াসাচ্ছন্ন। মার মত বড় বড় চোখ নেই সীতার, তাই বোধ হয় চোখ দুটি পর্য্যন্ত তার কল্পনার সীমান্তে সরে গেছে ধারণা হয়। সীতার মৃদু ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, আচমকা ঘনিয়ে আসা গাম্ভীর্য্য, তিক্ত বিষাদ আর কটু অনুকম্পা ভরা কথা এবং কদাচিৎ হেমন্ত যে কোন শ্রেণীর জীব ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না এমনি বিব্রত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, এসব যেন প্রায় ভুলে যাওয়া অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হয়ে গেছে, এসবের জন্য যে প্রতিক্রিয়া জাগত নিজের মধ্যে তাই যেন হেমন্তের অবলম্বন।

অথচ, আজকেই দেখা হয়েছিল সীতার সঙ্গে।

'এসো ভালো ছেলে' বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সীতা। বলেছিল, 'ক্লাশ হল না বলে কষ্ট হচ্ছে? মন খারাপ? কি

করব বল! সবাই তো বিদ্যালাভ করেই খুসী থাকতে পারে না, অন্যায়-টন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাতে চায়।'

আজ যেন রীতিমত ঝাঁজ ছিল সীতার কথায়, শুধু ব্যঙ্গাত্মক খোঁচা নয়। হেমন্তের মনে হয়েছিল, সে যেন শেষ পর্য্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠেছে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে। তার সঙ্গে মতে না মিলুক; তার নিরুত্তাপ রক্ষণশীল মতিগতিকে অবজ্ঞা করুক, তার একাগ্র নিষ্ঠা, নিরুপদ্রব সহনশীলতা, দুঃখী মায়ের জন্য তার ভালবাসা, এসবের জন্য খানিকটা শ্রদ্ধা তাকে সীতা বরাবর দিয়ে এসেছে। আজ যেন সে শ্রদ্ধাও সে রাখতে পারছে না মনে হয়েছিল হেমন্তের, তাকে যেন সহ্য করতে পারছে না সীতা।

'অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত বৈ কি।'

'তবে?'

'বিদ্যালাভে অবহেলা করাও অন্যায়, অন্যায় সহ্য করাও অন্যায়।'

'তবে?

তখন হেমন্ত বুঝেছিল সীতার জ্বালার মর্ম্ম। কিছু না বলেও সীতা তাকে প্রশ্ন করেছে, আজও তুমি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে তোমার আদর্শবাদী সুবিধাবাদের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার অজুহাতে? আজও তুমি এটুকু স্বীকার করবে না যে শিক্ষার্থীকেও আজ অন্তত ভাষায় ঘোষণা করতে হবে এ অন্যায়ের

দেশব্যাপী প্রতিবাদকে সে সমর্থন করে, সেটা রাজনীতি চর্চা হোক বা না হোক?

জবাব দিতেই হবে সীতার এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের। গভীর বিষাদ অনুভব করেছিল হেমন্ত। সীতা কি বুঝবে তার কথা?

'আমার কি মুস্কিল জান সীতা?' হেমন্ত ভূমিকা করেছিল, 'আমি সিরিয়াসলি কথা বললেও তুমি সিরিয়াসলি নিতে পার না!'

'কথা। তোমার শুধু কথা!'

'তা ছাড়া কি করার আছে? প্রতিবাদ যে জানানো হবে, তাও তো কথাতেই?'

তখন কি হেমন্ত জানত মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করা কথা কত সহজে কি অনিবার্য্য ভাবে কাজে রূপান্তরিত হতে পারে: কণ্ঠের প্রতিবাদ পরিণত হতে পারে জীবন-পণ ক্রিয়ায়!

সীতা চুপ করে থাকায় আবার সে বলেছিল, 'কথাকে অত তুচ্ছ করো না সীতা। মানুষ বোবা হলে পৃথিবীটা অন্য রকম হত। ওসব বড় দার্শনিক কথায় যাব না। আমার কথাটা মন দিয়ে শুনবে কি শান্ত হয়ে? তুমি তো জানো, আমি যা বলি তাই করি। কথার প্যাঁচও কষি না, ফাঁকিবাজী কথাও বলি না।'

'শুনি তোমার কথা।'

'তুমি কি বুঝবে আমার কথা?'

'পারবে বুঝিয়ে দিতে?'

অতি বিশ্রী, অতি নীরস নীরবতা এসেছিল কিছুক্ষণের।

সাহস সঞ্চয় করে হেমন্ত বলেছিল তারপর, 'অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে নিশ্চয়, কিন্তু তারও তো নিয়ম আছে, যুক্তি আছে? ধরো তুমি আমার সঙ্গে আছ, কেউ তোমায় অপমান করল। তখন সোজাসুজি ঘুষি মেরেই আমি সে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাব।'

সে এক পুরানো ঘটনা। আজকের বক্তব্য বুঝিয়ে দেবার জন্য তার সেই বীরত্বের ইঙ্গিত সে কেন করেছিল হেমন্ত জানে না। এই উদাহরণ দিয়ে তার বক্তব্য খুব সহজে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে বলা যেত বটে কিন্তু সেটা অন্য ভাবেও বলা যেত।

'আমি ভুলিনি ভালো ছেলে। কৃতজ্ঞ আছি।'

'সেজন্য তুলিনি কথাটা' হেমন্তকে বলতে হয়েছিল চাবুকের জ্বালা হজম করে, 'আমার কথা শুনলেই বুঝতে পারবে। ও-ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কর্তব্য ছিল, করেছিলাম। পরাধীন দেশে হাজার হাজার অন্যায় চলে, তার প্রতিবাদ করতে গেলে আমি দাঁড়াই কোথায়? দেশে চল্লিশ কোটি লোক, তার মধ্যে আমরা ক'জন লেখাপড়া শিখছি তুমি জানো। এ দেশে আমাদের ভাল করে লেখাপড়া শেখাটাই কার্য্যকরী প্রতিবাদ লড়াই করা। শিক্ষিত লোকের কত দরকার দেশে, আমরা সামান্য যে ক'জন সুযোগ পেয়েছি, তারা নাই বা গেলাম হৈ-চৈয়ের মধ্যে?'

সীতার চাউনিতে বোধ হয় ঘৃণাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

'সব কিছু থেকে ও-ভাবে গা বাঁচিয়ে কারা লেখাপড়া শেখে জানো ভালো ছেলে? দেশের প্রয়োজন, দেশের কথা যারা ভাবে তারা নয়, পাশ করে পেশা নিয়ে নিজে আরামে থাকার কথা যারা ভাবে তারা। স্বদেশী মার্কা মালিকের পাপের ছুতো যেমন এই যুক্তি যে ইণ্ডাষ্ট্রীতেই দেশের উন্নতি, তোমাদের যুক্তিটাও তাই। ছাত্র-আন্দোলন যারা করে তোমার চেয়ে তারা ভাল করে লেখাপড়ার দরকার বোঝে। তারাই জোর করে বলে ছাত্রদের, ডিসিপ্লিন বজায় রাখা প্রথম কর্ত্তব্য ছাত্রের, শিক্ষার যতটুকু সুযোগ আছে প্রাণপণে তা গ্রহণ করতে হবে প্রত্যেক ছাত্রকে, পরীক্ষায় পাশ করাটা মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। তাই বলে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাদের কোন যোগ থাকবে না? তারা প্রকাশ করবে না তাদের রাজনৈতিক মতামত, সঙ্ঘবদ্ধ হবে না তাদের দাবী, তাদের ক্ষোভ, তাদের দেশ-প্রেমের প্রকাশকে জোরালো করে তুলতে?'

'তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছি ছাত্র-জীবনে।'

'তার ফল? ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি বেড়েছে, দুর্নীতি বেড়েছে? সেটা কিসের ফল হেমন্ত? দেশকে ভালবাসার, স্বাধীনতা দাবী করার, ছাত্রদের এক করার আন্দোলন চালানো, এ সবের ফল? তলিয়ে যা বুঝবার চেষ্টা পর্যন্ত কর না, কেন তা নিয়ে তর্ক কর? খারাপটাই দেখছো, অথচ তার কারণ

কি বুঝতে চাও না, মন-গড়া কারণ, মন-গড়া দায়িক খাড়া করে তৃপ্তি পাও---আমার কথাই ঠিক! ভাল লক্ষণগুলি তো চোখেই পড়ে না।'

'সে আমার দোষ নয় সীতা। খারাপ লক্ষণগুলিই চোখে পড়ে, ভালগুলি পড়ে না, তার সোজা মানে এই যে ভাল লক্ষণ বিশেষ নেই চোখে পড়বার মত।'

'তুমি আজ এসো হেমন্ত।'

রাগে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল হেমন্তের চিন্তা, জ্বালা ধরে গিয়েছিল বুকে। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। সীতা তাকে শুধু সহ্যই করে এসেছে চিরকাল, আজ তার সেই ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, এটা বিশ্বাস করা কঠিন হেমন্তের পক্ষে। সীতা চায়ও না চোখ-কান বুজে সে তার মতে সায় দিক, তার কথা মেনে নিক। মতের বিরোধ তাদের আজকের নয়, অনেকবার তাদের কথা-কাটাকাটিতে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনায় আজকের তর্ক তাদের খুব ঠাণ্ডাই হয়েছে বলতে হবে। কেন তবে সে অসহ্য হয়ে উঠল আজ সীতার কাছে? এমন কোন সিদ্ধান্তে কি সীতা এসে পৌঁচেছে তার সম্বন্ধে যার পর তার সঙ্গে ধৈর্য্য ধরে কথা বলা আর সম্ভব হয় না? বুদ্ধি দিয়ে কথাটা বুঝবার চেষ্টা করেছিল হেমন্ত, কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। তখন হাল ছেড়ে দিয়ে ভেবেছিল, অত জটিলতার মধ্যে যাবার তার দরকার কি? মনটা হয়তো ভাল ছিল না সীতার কোন

কারণে। মেজাজটা হয়তো বিগড়েই ছিল আগে থেকে। মন কি ঠিক থাকে মানুষের সব সময়!

সীতার তীব্র বিরাগের রহস্য যেন একটু স্বচ্ছ হয়েছে এখন। দু'টো-একটা ইঙ্গিত জুটেছে রহস্যটা আয়ত্ত করার। কতগুলি বিষয়ে বড় বেশী সে গোঁড়া হয়ে পড়েছিল সন্দেহ নাই। পৃথিবীটা সত্যই অনেক বদলে গেছে। তার কল্পনাতীত ঘটনা সত্য সত্যই আজ ঘটছে তারই চোখের সামনে; দেশের মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন এসেছে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, ছেলেদের মধ্যেও। নতুন ভাব, নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ, নতুন উদ্দীপনা এসেছে---নতুন চেতনার লক্ষণ মোটেই আর অস্পষ্ট নয়। তারই শুধু এ সব চোখে পড়েনি। নিজের পুরানো ধারণা, পুরানো বিশ্বাসের স্তরেই সে ধরে রেখেছিল দেশকে চোখ-কান বুজে, ভেবেছিল তার মন এগোয়নি বলে দেশটাও পিছনে পড়ে আছে তারই খাতিরে!

এই গোঁড়ামি সহ্য হয়নি সীতার। মতের অমিলকে সীতা গ্রহণ করতে পারে সহজ উদারতায়, অন্ধ গোঁড়ামি তার ধৈর্য্যে আঘাত করে।

ঘোড়ার পায়ে পিষে ফেলবার চেষ্টার পর ঘোড়সওয়ারেরা তখন ফিরে গেছে। পাশের ছেলেটি বলছিল: 'কি সুন্দর ঘোড়া-

গুলি! তালে তালে পা ফেলছে আর মাসেলগুলিতে যেন ঢেউ খেলছে নেচে নেচে।'

বয়স তার পনের ষোল বছরের বেশী হবে না। রোগা চেহারা, ফর্সা রঙ, খুব ট্যাঙ্গা। আলোয়ানটা এমন করে গায়ে জড়িয়েছে আরাম করার ভঙ্গিতে যেন আসরে বসেছে গান-বাজনা শুনে বা সিনেমা-থিয়েটার দেখে উপভোগ করতে।

'কত তোয়াজে থাকে।' বলেছিলে চশমা-পরা যুবকটি গম্ভীর ভাবে। তার উৎসুক দৃষ্টি ক্রমাগত সঞ্চালিত হচ্ছিল এদিক্ হতে ওদিকে, মনে মনে সে যেন মাপছে ওজন করছে হিসাব কষছে যাচাই করছে ছোট-বড় ঘটনা ও পরিস্থিতির বিশেষ এক মূল্য।

'এমন ইচ্ছে করছিল ঘোড়ার গা চাপড়ে দিতে!' ট্যাঙা ছেলেটি বলেছিল নির্ব্বিকার ভাবে, 'মাথাটা বোধ হয় ফাটিয়ে দিত তা'হলে।'

দিত কি? একটা কেমন খটকা লেগেছিল নারায়ণের মনে। তাদের কাছ দিয়ে যে ঘোড়াটি ঘুরে গেছে, ওর ছেলে-মানুষী চোখ দেখেছে তার মসৃণ চামড়ার নীচে পরিপুষ্ট মাসেলের ঢেউ, নারায়ণের চোখ দেখেছে পাগড়ী আঁটা বিশাল গোঁফওলা অতি জবরদস্ত চেহারার ভারতীয় সওয়ারটির ঘোড়া চালাবার কায়দার মধ্যে অনিচ্ছার সংকেত, দ্বিধা, গোপন সতর্কতা।

খেলার মাঠে এদের বেপরোয়া ঘোড়া চালানো দেখেছে নারায়ণ অনেকবার। আজকের চালানোটাই যেন অন্য রকম।

সত্যই কি দেখেছে, না সবটাই তার কল্পনা? অথবা এই রকমই ওদের রাজপথের জনতা ছত্রভঙ্গ করার রীতি?

রীতি যাই হোক্, জখম হয়েছে অনেক।

'ইস্!'

হাঁটুতে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে ঢ্যাঙা ছেলেটি বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। নারায়ণও চেয়ে থাকে। রাস্তায় শুয়ে পড়ে মোচরা-মুচরি দিচ্ছে একটি আহত ছেলে।

আগুনের হল্‌কা যেন বেরোয় নারায়ণের দু'চোখ দিয়ে, অসহ্য জ্বালা যেন কথার রূপ নেয়, 'ওই টুপিওলাটার কাজ, টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেললে তবে ঠিক হয়। বসে আছে সব হাত গুটিয়ে। সবাই মিলে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেললে---'

গলা বুজে যায় নারায়ণের।

'কি যে বলেন!' ছেলেটি ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে বড় বড় টানা চোখে তাকিয়ে থাকে। আশ্চর্য্য সুন্দর ওর চোখ দুটি।

'তোমার ইচ্ছে করে না খোকা---'

'আমার নাম রজত।'

'রজত? রজত নাম তোমার? তোমার ইচ্ছে করে না রজত, ওটাকে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলতে?'

'করে তো, সবারি ইচ্ছে করে। কিন্তু শুধু ইচ্ছে করলেই তো হয় না? যা ইচ্ছে তাই করলে চলে নাকি!'

এতটুকু ছেলের মুখে বুড়োর মত কথা শুনে নারায়ণ একটু থতমত খেয়ে যায়। বুঝতে সে পারে যে যাই সে বলুক এরকম বুড়োর মতই জবাব দেবে ছেলেটা, তবু সে বলে, 'সবাই মিলে তেড়ে গিয়ে ওদের কটাকে পিষে থেঁতলে দিলে এরকম করতে সাহস পায় ওরা?'

'পায় না? কিছু বোঝেন না আপনি।' গভীর দুঃখের সঙ্গে রজত বলে, তার সেই গুরুমশায়ী আপশোষের সঙ্গে কথা বলা এমন অদ্ভুত ঠেকে নারায়ণের কাণে!—'আমরা মারামারি করতে গেলেই তো ওদের মজা। তাই তো ওরা চায়। আমরা তো আর আমরা নই আর, এখন হলাম সারা দেশের লোক। ওরা জানে, বাড়াবাড়ি করলে চাদ্দিকে কি কাণ্ড বাধবে। দেখছেন না রাগ চেপে শুধু খুচ্‌ খুচ্‌ ঘা মারছে? আমরা যাতে ক্ষেপে যাই? ইচ্ছে করলে তো দু' মিনিটে আমাদের তুলো ধুনো করে দিতে পারে, দিচ্ছে না কেন? আমরা যেই মারামারি করতে যাব, বাস্‌, আমরা আর দেশের সবাই থাকব না, শুধু আমরা হয়ে যাব। লোকে বলবে আমরা দাঙ্গা করে

মরেছি।' ঠোঁট গোল করে' একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে রজত 'আপনাদের মত রগচটা লোক নিয়ে হয়েছে মুস্কিল। কিছু বোঝেন না, তিড়িং তিড়িং শুধু লাফাতে জানেন।'

মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে নারায়ণের। কিশোর ঠিক নয়, বালকত্ব ছাড়িয়ে সবে বুঝি কৈশোরে পা দিয়েছে। সে যেন আয়ত্ত করে ফেলেছে নবযুগের বেদবেদান্ত উপনিষদ সেকালের ঋষি-বালকদের মত, পুরাণেই যাদের নাম মেলে। এইটুকু ছেলে যদি এমন করে বলতে পারে এসব কথা, শক্তিপুত্র পরাশর যে মায়ের গর্ভে থেকেই বেদধ্বনি করে পিতামহ বশিষ্ঠের আত্ম-হত্যা নিবারণ করবে সে আর এমন কি আশ্চর্য্য কাহিনী!

'তুমি কোন ক্লাশে পড় রজত?'

'যে ক্লাশেই পড়ি না।'

'রাগ করলে?' নারায়ণ অনুনয় করে বলে, 'যে ক্লাশেই পড়, সে কথা বলিনি। আমি অন্য কথা বলছিলাম।'

'কি বলছিলেন?'

'বলছিলাম কি, স্কুলে তো এসব শেখায় না, তুমি যে এসব কথা এমন আশ্চর্য্য রকম বোঝ, এসব তোমায় শেখাল কে?'

রজত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'আমিই শিখেছি, খানিকটা দিদি শিখিয়েছে।' মুখ কাছে এনে অতিবড় গোপন কথা বলার মত নীচু গলায় রজত বলে, 'ওইখানে দিদি বসে আছে— তাকাবেন না। আমি এখানে আছি টের পায়নি।'

নারায়ণ গম্ভীর হয়ে বলে, 'উনি কিন্তু টের পেয়েছেন রজত।'

শুনে রজত ভড়কে যাবে ভেবেছিল নারায়ণ, কিন্তু রজত জিভে ঠোঁটে তার সেই অদ্‌ভুত আওয়াজটাই শুধু করে একবার। ---'টের পেয়েছে? আপনি কি করে জানলেন?'

'দু তিনবার তোমায় ডাকলেন নাম ধরে। শুনতে পাওনি?'

কোন বিষয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করা যেন স্বভাব নয় রজতের। ঘাড় উঁচু করে দিদির দিকে মখ করে সে চেঁচিয়ে ডাকে, 'দিদি! ডাকছিলেন নাকি আমায়?'

শান্তি বলে, 'এদিকে আয়। কথা শুনে যা।'

'কি করে যাব?' রজত প্রতিবাদ জানায়, 'জায়গা বেদখল হয়ে যাবে আমার।' আরও গলা চড়িয়ে বলে, 'যা বলবার বাড়ীতে গিয়ে বোলো, কেমন?'

অনেক দিন পরে নারায়ণ কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে, নিদারুণ হতাশার জ্বালা যেন তার নেই আর। আশ্চর্য্য রকম শক্ত আর সমর্থ মনে হয় নিজেকে। তারই দুঃসহ আক্রোশের যে চাপ তাকেই ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে, সেটা যেন কার্য্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে সে অনুভব করে। পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চিত যে ঘৃণা, জীবন্ত মর্ম্মান্তিক ঘৃণা, অস্থির চঞ্চল করে রাখে তাকে সব সময়, নতুন করে নাড়া লাগলে যেন উন্মাদ করে তোলে, নিজে বয়লারের মত শক্ত হয়ে সেই প্রচণ্ড ঘৃণার বাষ্পকে সে যেন

আয়ত্ত করেছে এখন, চাকা ঘুরবে এগিয়ে যাবার। তারই মত এদের সবার বুকে ঘৃণা, এতটুকু ছেলেটার পর্য্যন্ত। কিন্তু সে আর পরাজিতের, পদদলিতের নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলে পুড়ে মরার ঘৃণা নেই, তা এখন জয়লাভের প্রেরণার উৎস।

রাস্তায় শুয়ে পড়ে যে ছেলেটি মোচরামুচরি দিচ্ছিল তাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার পরেও সেই স্থানটির দিকে কেমন এক জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থেকে কি যেন ভাবে রজত। এতক্ষণ পাশে বসে আছে, এমন চিন্তিত তাকে নারায়ণ দ্যাখেনি।

'দিদি বকবে নাকি বাড়ী গেলে?'

'কেন? বকবে কেন?'

'কি তবে ভাবছ এত একমনে?

'কি ভাবছি?' বেশ একটু বিনয়ী, লাজুক ছেলের মত কথা কয় রজত, 'ভাবছি কি, ওকে নিয়ে কবিতা লিখতে চাইলে কি করে লেখা যায়।'

'কাকে নিয়ে?'

'ওই যে মোচরামুচরি দিচ্ছিল ছেলেটা।'

'তুমি কবিতা লেখো?'

'লিখি। ছাপতে দিই না, পরে দেব। দিদি বলে, লিখে লিখে হাত না পাকলে ছাপতে দিতে নেই। আচ্ছা, এরকম করে যদি আরম্ভ করা যায়? সাদা সওয়ারের প্রকাণ্ড ঘোড়া নাচে, বুক পেতে দেয় ছেলেরা খুরের নীচে। নাঃ,

এ হল না। বুক পেতে দেবে কেন? অত সখে কাজ নেই।
কিন্তু---'

রজত ভাবতে থাকে।

আয়োজন দেখে রসুল ভাবে, এবার লাঠি চার্জ হবে।

কপালের ডান দিকে পুরানো ক্ষতের চিহ্নটা চিনচিন করে ওঠে তার। ক্ষতের এ দাগ মিলোবে না কোন দিন, স্মৃতিও নয়। স্মৃতি মিলিয়ে যাবে হয়তো চোখ বোঁজবার আগেই, ক্ষতের দাগ মিলোবে না যত দিন পর্য্যন্ত কবরে সে মাটিতে পরিণত হয়ে না যায়।

'এবার লাঠি চার্জ হবে মালুম হচ্ছে আবদুল।'

'হবে না কি? একটা সিগারেট দে তবে টেনে নি।'

ক্ষতটা লাঠির, প্রশস্ত কপালের ডান পাশে চুলের ভেতর থেকে ডান চোখের ভুরু পর্য্যন্ত চিরস্থায়ী ক্ষতের যে দাগটা আছে। মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে যে এই পুরস্কার জোটে মানুষের, আজও বিশ্বাস করতে পারে না রসুল। দুর্ভিক্ষের সময় পড়া ছেড়ে দিয়ে সে গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল, কয়েক জনকেও যদি বাঁচাতে পারে। গাঁয়ের নাম চিরবাগী, জমিদার শচীপলা-কান্ত বসু। গাঁয়ে পৌঁছবার তিন দিন পরে দাফন কাফন সারতে হয়েছিল তার নিজের মায়ের। না খেয়ে মা তার মরেননি, অসুখে মারা যান। আকস্মিক এ আঘাতেও সে

কাবু হয়নি, কোমর বেঁধে উঠে-পড়ে লেগেছিল গাঁয়ে একটা রিলিফ সেণ্টার খুলতে। হঠাৎ এক দিন তার কাছে হাজির হয়েছিল জিয়াউদ্দীন, শ্রীচপলাকান্তের নায়েবজাতীয় স্থানীয় কর্ম্মচারী। গাঁয়ের শতকরা আশী জন প্রজা মুসলমান। আসল নায়েব নকুড় ভট্টাচার্য্য, শাসন চালায় জিয়াউদ্দীন------শত অত্যাচার চালালেও কেউ যাতে না বলতে পারে যে হিন্দু অত্যাচার করেছে মুসলমানের ওপর।

'এ গাঁয়ে রিলিফ সেণ্টার কেন? অন্য কোথাও কর গিয়ে। কত্তা বলেছেন, ও-সব হাঙ্গামা এখানে চলবে না।'

খেতে না পেয়ে গাদা গাদা লোক মরছে, তাদের কয়েক জনকে কোন মতে জীয়ন্ত রাখার চেষ্টার নাম হাঙ্গামা! আসল কথা ছিল ভিন্ন। গাঁয়ে রিলিফ সেণ্টার হলে, মানুষ বাঁচানো আন্দোলন চললে, বাইরের নজর এসে পড়তে পারে চিরবাগীর ওপর। জমিদারীর আয়ে চলে না, তাই শ্রীচপলাকান্ত কারবার করছিল। অন্যায় অনাচার নোংরামি মজুতদারী চোরা কারবার এ সমস্তের কি কার কাছে ধরা পড়ে কে জানে; ঘুষ খায় না এমন অফিসার একজনও যে নেই তাই বা কে বলতে পারে।

তবু রসুল থামেনি। চালা তুলেছিল, খাদ্য জুগিয়েছিল, ভলাণ্টিয়ার গড়েছিল,—নিজে পেছনে থেকে। খিচুড়ি বিতরণ আরম্ভ করার আগের দিন বিকালে লালদীঘির ধারের মাঠে সভার আয়োজন করেছিল—নিজে পেছনে থেকে। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের

বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ডাকা সেই সভায় কি করে দাঙ্গা বেধেছিল রসুল জানে না, সভার এক কোণে দাঙ্গা বাধার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে লাল পাগড়ীর আবির্ভাব হয়েছিল তাও সে বুঝতে পারেনি। লাঠির ঘায়ে কপাল ফাঁক হয়ে হাজার ফুলকি দেখে ঘুরে পড়বার ঠিক আগে এক লহমার জন্য লাল পাগড়ীর নীচেকার মুখটি সে দেখেছিল, আজও সেই পৈশাচিক আক্রোশে বিকৃত মুখের ছাপ তার মনে আঁকা হয়ে আছে।

কেন এ আক্রোশ? কেন এ বীভৎস হিংসা? জগতের কোন অন্যায়, কোন অনিয়মের সঙ্গে খাপ খায় না, এ যেন অন্যায়ের, অনিয়মেরও ব্যাভিচার! মাথা ফাটাবার হুকুম পেয়েছিল, মাথা ফাটাক। ক্ষমতার দম্ভে প্রচণ্ড উল্লাস জাগুক মাথা ফাটাতে, তার মাথা তুলবার স্পর্দ্ধায় রাগে ফেটে যাক কলিজা, সব সে মেনে নিতে রাজী আছে মানানসই বলে। কিন্তু সে-ই যেন যুগ যুগ ধরে অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত করেছে, অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে উন্মাদ করে দিয়েছে, এমন অন্ধ উৎকট প্রতিহিংসার বিকার কেন?

রসুল জানে না। মনের পর্দ্দায় প্রশ্নটা তার স্থায়ীভাবে লেখা হয়ে আছে ক্ষোভের হরফে।

প্রথম দিকে কোলাহল প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল সমবেত মানুষগুলির বিক্ষুব্ধ গর্জনে, এখন শান্ত হয়ে কলরবে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রদের শৃংখলা ও শান্ত সংযত চালচলনের প্রভাব জনতার

মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে, সংযম হারিয়ে তাদের ক্ষেপে উঠবার সম্ভাবনা আর নেই। উত্তেজনা ও বিশৃংখলার অভাবটা অদ্ভুত লাগে রসুলের, সে গভীর উল্লাস বোধ করে। ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজনায় ভরে গেছে নিশ্চয় বুকগুলি, কিন্তু মাথাগুলি ঠাণ্ডা আছে। রসুলের মনে হয়, সে যেন কত যুগ-যুগান্ত ধরে এমনি গরম হৃদয়ে ঠাণ্ডা মাথার সমন্বয় প্রার্থনা করে আসছিল তার দেশের মানুষের কাছে, আজ এখানে দেখতে পাচ্ছে তার কামনা পূর্ণ হবার সূচনা।

নিখুঁত ছাঁটের দামী সুন্দর পোষাক পরা সার্জেণ্টরা দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে, ওদের হৃদয়ে কি ভাব ও মনে কি চিন্তা ঢাকা পড়ে আছে বাইরের রাজকীয় নিশ্চিন্ততা ও অগ্রাহ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উদ্ধত ভঙ্গিতে? ওদেরি জন্য সৃষ্টি করা চাকরীর গৌরব ও গর্ব্বই বেচারীদের সম্বল, তারই মধ্যে ওরা সাত হাজার মাইল দূরের দ্বীপটির মাটির সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করে জন্ম-ভূমির মাটিতে হাঁটবার সময়। চিরবাগী গাঁয়ের নুরুলের রাজ-হাঁস দু'টির কথা মনে পড়ে যায় রসুলের।

পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে দেশী পুলিশেরা, নির্ব্বাক্ নিশ্চল। হুকুমজারি হয়নি এখনো চার্জ করবার। পাশের রাস্তায় ভিড়ের শেষ প্রান্ত যতদূর সম্ভব ভেদ করে গাড়ী এগিয়ে এনে, গাড়ী থেকে নেমে ভিড় ঠেলে পুলিশের এলাকায় এসেছেন ব্যস্ত-সমস্ত এক ভদ্রলোক, অত্যন্ত উত্তেজিত বিব্রত আর অসহায়

মনে হয় তাঁকে। এই শীতে গায়ে তাঁর আদ্দির পাঞ্জাবী, ফিকে মহুয়া রঙের দামী শাল অবশ্য আছে কাঁধে জড়ানো। ওঁর আবির্ভাবের জন্যই হয়তো স্থগিত রাখা হয়েছে লাঠি চার্জের হুকুম।

হাত নেড়ে নেড়ে ভদ্রলোক কি বললেন সার্জেণ্টদের দলপতিকে বোঝা গেল না, তারপর অতি কষ্টে তিনি উঠে দাঁড়ালেন একটি পুলিশবাহী লরীর উপর। কোন নেতা নিশ্চয়, রসুল চেনে না।

'উনি কে রে আবদুল?'

'জানি না। চেনা চেনা লাগছে—'

লরীর ওপর দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে ভদ্রলোক প্রাণপণে চীৎকার করে ঘোষণা করলেন, স্বয়ং বসন্ত রায় নির্দ্দেশ পাঠিয়েছেন, হাঙ্গামা না করে সবাই ঘরে ফিরে যাক্।

হাজার কণ্ঠের গর্জনে তার জবাব এল, কোথায় বসন্ত রায়? উপদেশ চাই না। হাঙ্গামা নেই, চুপ করে বসে আছি। বসে থাকব যত দিন দরকার। উপদেশ চাই না।

অতি কষ্টে লরী থেকে নেমে ভদ্রলোক হাত নেড়ে নেড়ে কিছুক্ষণ কথা কইলেন সার্জেণ্টদের দলপতির সঙ্গে, তারপর ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন তাঁর গাড়ীর দিকে পাশের রাস্তায়।

আবার শান্ত হয়ে গেল চারিদিক।

আবদুল বলে, 'এবার চিনেছি, অমৃতবাবু। বসন্ত রায়ের একজন ফেউ। সব মিটিং-এ হাজির থাকে, বক্তৃতা দেবার খুব সখ। কিন্তু বিশেষ বলতে পায়ও না, বলতে পারেও না ভালো।'

'এমন লোককে পাঠানোর মানে?' রসুল বলে বিরক্তির সুরে।

'পাঠিয়ে দিলো যাকে পেলো হাতের কাছে।'

'এভাবে চলে যাবার হুকুম পাঠানো উচিত হয়নি। নিজে এসে সব জেনে বুঝে---'

'গরজ পড়েছে!' আবদুল বলে অবজ্ঞার সঙ্গে।

হৈ-চৈ হুল্লোড় নেই, হাঙ্গামা নেই, কিন্তু চারি দিকের থমথমে ভাবটাই কেমন উগ্র মনে হয় রসুলের। ধৈর্য্যের পরীক্ষা যেন চরমে উঠেছে।

'লাঠি চার্জ হবে না বোধ হয়', আবদুল বলে।

'কি জানি।'

'ব্যাপার কোথায় গড়াবে ভাবছি। দু'পক্ষই চুপ-চাপ থাকবে এমনি ভাবে?'

'তাই কখনো থাকে? এক পক্ষ ভাঙ্গবেই, ধৈর্য্য হারাবে।'

'আমরা চুপ চাপ আছি। ওরা তো মিছেমিছি হাঙ্গামা বাধাবে না। তবে?'

'দেখা যাক্। ডর লাগছে?'

'কিসের ডর? আমি তো একা নই।'

কথাটা বড় ভাল লাগে রসুলের। এমন কিছু নতুন নয় কথাটা চমকে দেবার মত, কিন্তু তারও অনুভূতির সঙ্গে মিলে যাওয়ায় মনের কথার প্রতিধ্বনির মত মিষ্টি মনে হয়। জখমের, রক্তপাতের, হয়তো বা মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন্ মহাপুরুষের কিছুমাত্র ভয় হয় না জানা নেই রসুলের। তার বেশ ভয় করে, বেশ জোর করেই ভয়টা বশে রাখতে হয় তাকে। ভয় তাকে কাবু করতে পারেনি কোন দিন কোন অবস্থাতে এইটুকুই সে সত্য বলে জানে, ভয় তার একেবারে হয় না এ মিথ্যাকে স্বীকার করতে লজ্জা তার হয়। নিজের কাছে বা পরের কাছে এর বেশী বাহাদুরী দেখাবার সাধ তার নেই, এইটুকুতেই সে সন্তুষ্ট। আজ ভয় ভাবনা বেশী রকম ক্ষীণ লাগছিল তার কাছে, বেপরোয়া সাহসের সঙ্গে নতুন একটা বিশ্বাসের, নির্ভয়ের ভাব অনুভব করছিল। আবদুলের কথায় তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে আবদুল ও তার সম অনুভূতি: সে একা নয়। আঘাতের বেদনা বা মৃত্যুর সমাপ্তি অনেকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাবে।

লাঠি চার্জ সুরু হয় খানিক পরে।

এ পরিচিত ঘটনা রসুলের। বিশৃংখলা কোলাহল, মানুষের দিশেহারা ছুটোছুটির মধ্যেও সে অনুভব করে লাঠি চার্জের উদ্দেশ্য সফল হবে না নিরস্ত্র কতগুলি যুবক ও বালক জখম হওয়া

ছাড়া। যারা নড়বে না ঠিক করেছে [illegible] হঠানো যাবে না। দু'জন পুলিশ এগিয়ে এসেছে কাছাকাছি। বেছে নেবার সময় ওদের নেই, এ ক্ষেত্রে সবাই সমানও বটে। রসুল পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে ডান দিকের পুলিশটির দিকে। ওদের সকলের মুখ তার চেনা মনে হয়, সবগুলি মুখ যেন এক ছাঁচে গড়া।

মাথা বাঁচাবার জন্য হাত দু'টি সে উঁচু করে ধরে। লাঠি এসে পড়ে কাঁধের কাছে, বাহুমূলে---লাঠির গোড়ার দিক্‌টা। লাঠি ধরে ছিল যে হাত, সে হাত ইচ্ছে করে লাঠি তাকে মারে আগা দিয়ে নয়, মাঝখান দিয়ে নয়, গোড়ার দিক্‌ দিয়ে। ব্যথা একটু লাগে, কিন্তু রসুল তা অনুভবও করতে পারে না। তার চোখ ছিল লাল-পাগড়ীর নীচেকার মুখটিতে আঁটা। সে স্পষ্ট দেখতে পায় লাঠি মারার সঙ্গে মুখটি তার দিকে চোখ ঠেরে চলে গেল।

'আবদুল! দেখিছিস্‌?'

'হুঁ। লেগেছে খুব? হাড় ভাঙেনি তো?'

'লাগেনি। একটুও লাগেনি। দেখিস্‌নি তুই?'

'কি? কি দেখিনি?'

চোখের পলকের ঘটনা, কি দেখতে কি দেখেছে কে জানে। লাঠির গোড়ার দিক্‌টা হয়তো এসে লেগেছে ঘটনাচক্রে। তবু রাজপথে বসে মনে মনে আকাশ-পাতাল আউড়ে যায় রসুল সে

যেন মুক্তি পেয়েছে, স্বাধীন হয়ে গেছে দেশের আকাশে মাটিতে খনিগহ্বরে সমুদ্রে। নিশ্বাসে সে স্বাদ পায় বাতাসের। পথের স্পর্শ তার লাগে অন্য রকম। গাঁয়ের সেই সভায় যেন থেমে গিয়েছিল তার মনের গতি, তারপর থেকে এত দিন যেন সে বাস করছিল সেই সভার দিনটি পর্য্যন্ত সীমা টেনে দেওয়া পুরানো পরিবর্ত্তনহীন জীবনে, পীড়ন পেষণ মৃত্যু দুর্নীতি হতাশার অভিশাপের মধ্যে। কিন্তু বদলে গেছে,---সব বদলে গেছে। ভোঁতা অন্ধকার হৃদয়ে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে গেছে নতুন চেতনা-স্পন্দন। জোয়ার ঢুকেছে এঁদো ডোবায়।

ক্ষতচিহ্নটা কি মিলিয়ে গেছে? চিন্ চিন্ করছে না যেন আর। মনে দাগ কেটে কেটে লেখা প্রশ্নটা হয়ে গেছে ঝাপ্‌সা, অকারণ। কেন যে এত ক্ষোভ, এত অসন্তোষ জাগিয়ে রেখেছিল সে একদিন একজনের অন্যায় করার নিয়মেরও ব্যভিচারে! ওরকম হয়। ওটা সৃষ্টিছাড়া কিছু ছিল না, সে যেমন ভাবত। জগতে যে একা করে দেখে নিজেকে, জীবনে কোন অন্যায় না করেও সেই পারে আত্মহত্যা করতে, অন্যায়ের আত্মগ্লানিতে সেই হতে পারে হিংস্র ক্ষ্যাপা পশু। পিছন থেকে অনায়াসে মানুষকে ছুরি মারে যে গুণ্ডা সে শুধু গুণ্ডাই থাকে যতদিন না পর হয়ে যায় তার অন্য সব গুণ্ডারা, একেবারে একা না হয়ে যায়,—তখন সে হয় বিকারেরও ব্যভিচার, সয়তান মানুষ থেকে আসল সয়তান।

'আবদুল, এবার কিছু ঘটবে।'

'কি ঘটবে?'

'জব্বর কিছু। দেখছিস্ না ছটফট করছে?'

গুলির আওয়াজের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রসুলের ডান হাতটা যেন খেয়াল খুসীতেই আচমকা ছিটকে লাফিয়ে উঠে অসাড় হয়ে পড়ে যায়।

আবদুল বলে, 'কোথায় লাগল দেখি?'

'ফাটা কপাল কি না, ডান হাতটাতেই লেগেছে।'

দু'জনেরি পরণে পাজামা। একটি ছেলে তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড় খুলে খানিকটা ছিঁড়ে নেয়, পকেটের রুমালটা দলা পাকিয়ে ক্ষতমুখে চেপে বসিয়ে জোরে কাপড় জড়িয়ে বাঁধতে থাকে।

রসুল বলে চলে, 'বাঁ হাতে সব হয়তো আবার অভ্যাস করতে হবে। সাইকেল চালিয়ে কলেজে যেতে অসুবিধে হবে না এক হাতে কিন্তু----'

আজকেই শেষ, অক্ষয় ভাবে, আজ একটু খেয়ে শেষ করে দেবে। জীবনে আর কোন দিন ছোঁবে না এ জিনিষ। আজ থেকেই আর খাবে না ঠিক করেছিল সত্য, দু' পেগের বেশী এক ফোঁটাও খাবে না ভেবে রেখেও জীবনে শেষ দিনের খাওয়া বলেই অনেক বেশী হয়ে গিয়েছিল কালকের পরিমাণ, তাও সত্য। কিন্তু কাল তো সে জানত না "আজ" এমন অভিজ্ঞতা

তার জুটবে, এমন অদ্‌ভুত অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে দেখবে সে চোখের সামনে। গুলির আওয়াজে কেঁপে কেঁপে উঠছে বুক আর বাতাস, আহত হয়ে পড়ে যাচেছ মরে যাচেছ আশে-পাশের মানুষ, মানুষ তবু নড়ে না, মৃত্যুপণ করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। নিজের চোখে দেখেছে ঘটনা এখনো শেষ হয়নি রাজপথের রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত নাটকের রোমাঞ্চকর মর্মান্তিক অভিনয়, তবু যেন সে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না এ ব্যাপার সত্যই ঘটেছে, এখনো রাস্তা জুড়ে জেদি মানুষগুলি প্রতীক্ষা করছে এর পর কি ঘটে দেখা যাক। উত্তেজনায় দেহ-মন তার কেমন হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে কেমন করছে। সে নয় গেল। আজ এই বিশেষ দিনে এই বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে একটু যদি সে খায়, একটা কি দু'টো মাত্র পেগ, এমন কি দোষের হবে সেটা?

সাড়ে আটটা বাজে। আধ ঘণ্টার মধ্যে বার বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর হোটেল আছে, কিন্তু সেখানে পেগের দামও বড় বেশী। তাড়াতাড়ি করে গিয়ে একটা কি দুটো গরম পেগ খেয়ে নিয়ে একটু তফাৎ থেকে এখানকার ব্যাপারের কি পরিণতি হয় কিছুক্ষণ দেখে বাড়ী ফিরে গেলে কি এমন ক্ষতি হবে কার? কি এমন অপরাধ হবে তার?

অলকাকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে তার শরীর-মনের অবস্থা বর্ণনা করে সে যদি সব কথা বুঝিয়ে বলে, সে কি বুঝবে না? বিশ্বাস করবে না যে শুধু এই জন্যই আজ সে একটু খেয়েছে, নইলে

সত্যই ছুঁতো না, নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা পালন করত? তবে, হয়তো কিছু বলারও দরকার হবে না অলকাকে। দু'-একটা পেগ খেয়ে গেলে অলকা হয়তো টেরও পাবে না। অতটুকুতে কিছুই হয় না তার। বেশ একটু মৌজের অবস্থাতেই ওকে দেখতে অলকা অভ্যস্ত, সে অবস্থা না দেখলেই সে খুসী হবে।

কিন্তু যদি গন্ধ পায়? ছিটকে সরে গিয়ে তফাতে দাঁড়িয়ে মুখে বেদনা ও হতাশার সেই অসহ্য ভঙ্গি এনে থর থর কাঁপতে থাকে আবেগ উত্তেজনার চাপে? বুঝিয়ে বলার পরেও যদি সে শান্ত না হয়, সুস্থ না হয়?

কোথায় গড়ানো জীবন নিয়ে আজ সে দাঁড়িয়েছে জীবনের এই অবিস্মরণীয় পরিবেশে। ধিক্ তাকে। শত ধিক্!

কিন্তু কি হয় একটু খেলে? আজকের মত পেগ খাবার এমন দরকার তো তার কোন দিন আসেনি। শুধু সখ করে নেশার জন্যই খেয়েছে এতদিন। আজ একটু খেয়ে মাথাটা ঠিক করে নেওয়া তার বিশেষ প্রয়োজন, মনের একটু জোর না বাড়ালে তার চলবে না। দরকারের সময় ওষুধ হিসাবেও তো মদ খায় মানুষ?

কি এক দারুণ অস্বস্তিতে টান টান হয়ে গেছে শিরাগুলি অক্ষয়ের। ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার মত মনটা পাক দিচ্ছে উপরে উঠে নীচে নেমে ঘুরে ঘুরে। আর কখনো কি সে এক-সঙ্গে অনুভব করেছে মদ খাবার এমন দুরন্ত তৃষ্ণা আর প্রবল বাধা

নিজের মধ্যে? সেই কখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ছোট ব্যালকনীতে। আলসেয় ভর দিয়ে ব্যথা ধরে গিয়েছে হাতে-পায়ে, শরীর আড়ষ্ট হয়ে এসেছে খানিকটা। ওরা তার চেয়ে অনেক আরামে বসে আছে পথে। তার মত নিরাপদ ওরা নয় কিন্তু সেটা কি খেয়াল আছে ওদের কারো, বিপদ বা নিরাপত্তার কথা? দোকানের আলোগুলি আজ রাস্তায় পড়েনি। ওপর থেকে স্তিমিত নিস্তেজ আলোয় পথের অবিস্মরণীয় নাটকের এখনকার শান্ত, সম্ভাবনাপূর্ণ দৃশ্যটির অভিনয় ও অভিনেতাদের দিকে চেয়ে ভিতরে তোলপাড় চলতে থাকে অক্ষয়ের। অগাধ বিষাদের সমুদ্রে সাইক্লোনিক মন্থনের মত। এত ক্লান্তি আর এত শূন্যতা কি আছে আর কারো জীবনে? এতখানি অসুস্থতা, আত্ম-বিশ্বাস? চিন্তা আর অনুভূতির গভীর বিপর্যয়ের মধ্যেও কে যেন তারই মনের মধ্যে বসে মৃদু ব্যঙ্গের সুরে বলছে, নিজের সঙ্গে খেলা এ সব মাতালের, এক পেগ টানো সব ঠিক হয়ে যাবে, বাজে চিন্তা উড়ে যাবে কুয়াসার মত, জীবন ভরে উঠে থই-থই করবে আনন্দে কয়েকটা পেগ চালাবার পরেই!

নিজেই কি সে জানে তার কথারও কোন মূল্য নেই, ভাবনা-চিন্তা অনুভতিরও কোন অর্থ হয় না? এলকোহলের বাষ্প মাত্র সব?

নিজেকেই সে বিশ্বাস করে না।

অথচ মরণের মুখোমুখী দাঁড়িয়েও তো মানুষ নিজের ওপর বিশ্বাস বজায় রাখতে পারে। মরে যদি মরণটাও তার কাজে লাগবে, এ বিশ্বাস নিয়ে মরতে তো পারে মানুষ।

এ রকম বিশ্বাস ছাড়া বুঝি স্বাদ থাকে না জীবনের, যেমন তার গেছে। জীবনে স্বাদ না থাকলে বুঝি বিশ্বাসও থাকে না কোন কিছুতে, তার যেমন নেই।

বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হৈ-চৈ করে কত রাত কেটে যায়, কিন্তু সেই চরম আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যেও সে থেকেছে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, একা। সে শুধু আদায় করেছে নিজের সুখ, কামনা করেছে নিজের উপভোগ, হাজার খুঁটিনাটি হিসাব ধরে মনে মনে বিচার করেছে কতটুকু সে পেল, ওরা তাকে ঠকালো কতখানি! রাজ-পথের ওদের সঙ্গেও সে একতা বোধ করতে পারছে না, ওদের জন্যই যত চিন্তা জেগেছে তার মনে সব সে পাক খাওয়াচ্ছে নিজেকে কেন্দ্র করে।

কীর্ত্তি ওদের, তাকে ছুতো করে সে একটু মদ খেতে চায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে। ওদের মৃত্যুঞ্জয়ী গৌরবকে আত্মসাৎ করে সে মেটাতে চায় তার উৎসবের বুভুক্ষা! ওরা তার কেউ নয়, তার কাছে ওদের মূল্য আর সার্থকতা শুধু এইটুকু যে ওরা তাকে দার্শনিক করে তুলেছে।

'এখন যাবেন কি বাবু? গেলে পারতেন।'

মাখন দিনে আপিসের বেয়ারা, রাতে আপিসের পাহারা-দার! বড় ছোট সাহেব আর বাবুরা কোন্‌কালে বেরিয়ে গেছেন আপিস থেকে ভালয় ভালয়, দু'শো টাকার এই বাবুটি টিঁকে আছেন এখন পর্য্যন্ত। এত কি ভয়, এত কি প্রাণের মায়া? সবাই বাড়ী যেতে পারল, ছেলেমানুষ সরল বাবু পর্য্যন্ত, ইনি ভয়ের চোটে তেতলা থেকে নীচেই নামলেন না মোটেই। রাতটা হয়তো এখানেই কাটাবার মতলব। জ্বালাতন করে মারবেন মাখনকে।

আবার বলে মাখন, 'ভয় নেই বাবু। আমি দু'বার বাইরে থেকে ঘুরে এসেছি। ওদিকে যাবেন না, পাশের রাস্তা দিয়ে ঘুরে বাড়ী চলে যান, কোন ভয় নেই। একটু হাঁটতে হবে।'

'মাখন---' অক্ষয় বলে, 'আমি মরতে ভয় পাই না।'

'আজ্ঞে না বাবু'---মাখন বলে সবিনয়ে। সে ভেবে পায় না বাইরে না বেরিয়েও অক্ষয় বাবু মাল টানলেন কি করে। সঙ্গেই থাকে হয় তো শিশিতে!

'আমি একটু ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছি মাখন। আমি ঘুরে এলে তুমি ঘুমোবে।'

'ঘুরে আসবেন?'

'ঘুরে আসব। বেশী দেরী হবে না, আধ ঘণ্টার মধ্যে।' সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায় অক্ষয়। দরোয়ান সদরের গেটে

একেবারে তালা এঁটে দিয়েছে। অক্ষয়কে দেখে সে অবাকও হয়, কথা শুনে রাগও করে।

'ঘুমকে আয়েগা ফিন?'

'জরুর আয়গা।'

গেটে তালা বন্ধ থাকবে, গেট খোলা রাখতে পারবে না রাম সিং। এতক্ষণ এ বাবু ভয়ে লুকিয়ে ছিল আপিসের ভেতরে, বাড়ী যেতে সাহস পায়নি! অবজ্ঞায় মুখ বাঁকা হয়ে যায় রাম সিংএর। কেন বাইরে যাচ্ছে বাবু সে বুঝে উঠতে পারে না। খাবার বা বিড়ি-সিগারেটের দোকান খোলা নেই কাছাকাছি, তাছাড়া ওদের জন্য তো বাবুদের নিজের বাইরে যাওয়া রীতি নয়, তাকেই হুকুম করত এনে দেবার। বাইরেই যখন যাচ্ছে বাবু, বাড়ী না গিয়ে ঘুরে আসবে কেন?

বাবুদের চাল-চলন বোঝা দায়, রাম সিং ভাবে তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতার জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে।

গেট পাশের রাস্তার ভিতরে। ঘটনা-স্থলের বিপরীত দিকে এগোতে আরম্ভ করে অক্ষয়, একটু ঘুরে বারে যেতে হবে। ইতিমধ্যে বার যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে? ন'টা প্রায় বাজে। বন্ধ না হলেও পেগ নিয়ে তাড়াতাড়ি গিলতে হবে। তার চেয়ে হোটেলেই কি চলে যাবে একেবারে? [illegible] আবার টাকা আছে কম। আজ ইচ্ছে করে বেশী টাকা নিয়ে বার হয়নি। বারের মালিক তাকে চেনে, সেখানে দু'এক পেগ

ধারে খাওয়া যেতে পারে। হোটেলে সঙ্গের পয়সায় দেড় পেগের বেশী হবে না।

বেশী খাবার মতলব তার আছে না কি?

মন যেন কথা কয়ে ওঠে জবাবে: আগে বারে চলো, ধারে চট-পট দু'তিন পেগ খেয়ে নিয়ে নগদ যা আছে তা দিয়ে হোটেলে বসে যতটা জোটে মৌজ করতে করতে খাওয়া যাবে।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। চাদরটা অক্ষয় ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। এই ঠাণ্ডায় ওরা কি সারা রাত রাস্তায় বসে থাকবে? শীতে জমে যাবে না? একটা জোরালো স্নায়বিক শিহরণ বয়ে যায় অক্ষয়ের সর্ব্বাঙ্গে, সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তেরাস্তার মস্ত মোড়ে, আলো সেখানে ঝলমল করছে বিশেষ ব্যবস্থায়। মাথাটায় কয়েক বার ঝাঁকি দিয়ে নেয়। তিন-চার বছর আগে হলেও সেও বোধ হয় পারত গুলির মুখে নির্ব্বিবাদে রাস্তায় বসে থাকতে, সারা রাত ধরে শীতে জমতে। চাকরী নিয়েও বেশ ছিল কিছু কাল, যুদ্ধের বাজারে উপরি আয়ের উপায়টা খুঁজে পাওয়ার পর থেকে এই দশা হয়েছে তার।

পূব দিক্ থেকে ফুটপাথ ধরে তাদের আপিসের মনমোহন হন-হন করে এগিয়ে আসছে, দূর থেকেই অক্ষয় চিনতে পারে। মোড়ে এসে মনমোহন তাদের আপিসের পথে বাঁক নেবে, অক্ষয় তাকে ডাকল।

অক্ষয় এখন এ অঞ্চলে কি করছে মনমোহন ভাল ভাবেই জানে। দু'জনে কাছাকাছি হওয়া মাত্র সে বলে, 'আমি বড় ব্যস্ত ভাই।'

'হাঙ্গামার ওখানে যাবি না কি?'

'হ্যাঁ, ওখানেই যাচ্ছি।'

'তুমি কখন খবর পেলে? আপিস থেকে বেরোতে দেখিনি তোমায়।'

'আমি সঙ্গেই ছিলাম। টিফিনের আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

মনমোহন একটু আশ্চর্য্য হয়ে অক্ষয়ের মুখের দিকে তাকায়। সহজ স্বাভাবিক ভাবেই বলছে অক্ষয়, মদ যে খেয়েছে বোঝা যায় না।

'এখন তবে--?' অক্ষয় প্রশ্ন করে, 'বাড়ী থেকে ঘুরে এলে বুঝি?'

কথা বলার সময় মনমোহন বোতাম খোলা কোটের দু'টি প্রান্ত বুকের কাছে দু'হাতে ধরে থাকে। খুব শীতের সময়েও অক্ষয় তাকে কোন দিন কোটের বোতামও লাগাতে দেখেনি, এই অভ্যাসের ব্যতিক্রমও দেখেনি।

'বাড়ী যাওয়া হয়নি। একজন নেতার কাছে গিয়ে-ছিলাম। আচ্ছা আসি ভাই আমি।"

'মদ খাইনি মোহন। বুঝলে? মদ আমি খাইনি। আমার সঙ্গে দু'টো কথা কইলে জাত যাবে না।'

তার আহত উগ্র কথার মধ্যে চাপা আর্ত্তনাদের সুরটাই বেশী স্পষ্ট হয়ে বাজে মনমোহনের কানে। মমতা সে একটু বোধ করে অক্ষয়ের জন্য, তার চেয়ে বেশী হয় তার আপশোষ। কোন স্তরে মানুষকে টেনে নিয়ে যায় মদ! এই সেদিনও সুস্থ সুখী, স্বাভাবিক ছিল এই মানুষটা। ব্যাঙ্কের কাজের অবসরে, ছুটির পরে, কত আগ্রহের সঙ্গে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা, চাষী-মজুরের ভবিষ্যৎ এসব বিষয়ে আলোচনা করেছে, স্থায়ী সমস্যা আর সাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে মত ও পথের কথায় ধরা পড়েছে তার ভিতরের একটা জিজ্ঞাসু, উৎসুক, তেজস্বী দিক্! কিছু দিনের মধ্যে কি ভাবে এলোমেলো হয়ে গেছে তার কথাবার্ত্তা, সব বিষয়ে আগ্রহ আর উৎসাহ গেছে ঝিমিয়ে! রাস্তায় হঠাৎ দেখা হলে পর্য্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে একজন তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে যেতে চাইলে আজ তার বিকারগ্রস্ত মন অপমান বোধ করে, অবজ্ঞা খুঁজে নিয়ে উথলে ওঠে ছেলেমানুষী অভিমান। এ ভাবটা যে চেপে রাখবে, একটু সংযম পর্য্যন্ত নেই।

শান্ত কণ্ঠে মনমোহন বলে, 'ছেড়ে দিয়েছেন?'

'ভাবছি ছেড়ে দেব।'

উপদেশের কথা কিছু বলা নিরর্থকও বটে, তাতে বিপদের ভয়ও আছে। মনমোহন তাই সহজ সুরে বলে, 'সামান্য

মাইনেতে তুমি ও-সব খাও কি করে তাই আশ্চর্য্য লাগে। ধার করোনি তো?'

'না। অত বোকা নই। কিছু টাকা ছিল।'

'একটা দরকারী খবর নিয়ে যাচ্ছি, দাঁড়াবার সময় নেই। রাগ করো না ভাই।'---বলে আর দেরী না করে মনমোহন জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে যায়।

মনমোহনও আরেকটা জ্বালা হয়ে আছে অক্ষয়ের মনে। ব্যাঙ্কে চাকরিটা নেবার অল্প দিনের মধ্যে অতি সুন্দর একটা পরিচয় গড়ে উঠেছিল তার ওর সঙ্গে, সহজ সংযত তৃপ্তিকর। হাসি-খুসী মিষ্টি স্বভাব মনমোহনের। কথাবার্ত্তা চালচলনে সাধারণ চলতি আত্মাভিমানেরও অভাবের জন্য প্রথমে তাকে খুব মৃদু ও নিরীহ মনে হয়েছিল। ধীরে ধীরে অক্ষয় টের পেয়েছে তার ভেতরটা বেশ শক্ত, মোটেই তলতলে নয়, গোবেচারিত্বের লক্ষণ নয় তার আচরণের মৃদুতা। মনমোহনের যে অনেক পড়াশোনা আর গভীর চিন্তাশক্তি আছে তা জানতেও সময় লেগেছিল। নিজের কথা বলতে যেমন, বহু কথা বলতেও মনমোহন তেমনি অনিচ্ছুক।

মনমোহন তাকে অবজ্ঞা করে, ঘৃণা করে। নিশ্চয় করে। অন্যের অশ্রদ্ধা স্পষ্ট বোঝা যায় মুখে কিছু না বললেও, মনমোহন শুধু সেটা গোপন করে রাখে অন্যের সঙ্গে তার অশ্রদ্ধা করার

তফাৎ কেবল এইটুকু। কেন এ দয়া দেখাবে মনমোহন তাকে, কে চেয়েছে তার উদারতা?

মনমোহনের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই আজকাল কেমন একটা গ্লানিকর অস্বস্তি বোধ করে অক্ষয়। পরে এর নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

বারে গিয়ে বোধ হয় আর লাভ নেই এখন। মনমোহনের কাছে কয়েকটা টাকা ধার চেয়ে নিলে কেমন হত? জীবনে ও উজ্জ্বলতর করে তুলেছে আলোক, ওর কাছে থেকেই টাকা নিয়ে সে তার জীবনের অন্ধকার বাড়াত। কি চমৎকার ব্যঙ্গ করা হত নিজের সঙ্গে।

ধিক্। তাকে শত ধিক্।

অনিচ্ছুক মন্থর পদে সে রাস্তা পার হয়। মিলিটারী পুলিশের একটা গাড়ী বেরিয়ে যায় তার গা ঘেঁষে, চাপা পড়ে মরলে অবশ্য অন্যায় হত তারই, এভাবে যে রাস্তা পার হয় তার জীবনের দায়িক সে নিজে ছাড়া আর কেউ নয়। সেও এক চমৎকার ব্যঙ্গ করা হত নিজের সঙ্গে, মনমোহনের কাছে টাকা ধার নিয়ে আজ মদ খাওয়ার মত। ওখানে ওরা গুলি খেয়ে মরেছে স্বেচ্ছায়, তাই প্রত্যক্ষ করে মনে ভাব জাগায় অসাবধানে রাস্তা পার হতে গিয়ে সে মরত গাড়ী চাপা পড়ে।

বারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় অক্ষয়। সময় অল্পই আছে, দু'চারজন করে বেরিয়ে আসছে লোক। বাড়ী ফেরার অসুবিধার

জন্য লোক আজ কম হয়েছে বোঝা যায়। অন্যদিন এ সময় আরও ভিড় করে লোক বেরিয়ে আসে।

যাবে ভেতরে? করে ফেলবে এদিক বা ওদিক একটা নিষ্পত্তি? এ উত্তেজনা সত্যি আর সওয়া যায় না। বুকের মধ্যে শিরায় টান পড়ে পড়ে ব্যথা করছে বুকটা।

অথবা এমন হঠাৎ একটা কিছু করে না ফেলে আরও কিছুক্ষণ সময় নেবে মন স্থির করতে? হোটেল তো আছে। কম হলেও পাবে তো সেখানে মদ। এমন হুট্ করে নাই বা করে বসল একটা কাজ পরে হাজার আপশোষ করলেও যার প্রতিকার হবে না?

এই চরম মুহূর্তে বড় বড় কথা আর ভাবে না অক্ষয়। দ্বিধার উত্তেজনা চরমে উঠে মনকে তার ভাব-কল্পনার রাজ্য থেকে স্থানচ্যুত করে বাস্তবে নামিয়ে দিয়েছে। সে ভাবে, আজ ভেতরে গিয়ে মদ খেলে শুধু সুধার কাছে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হবে না, অত্যন্ত অন্যায়ও করা হবে সুধার ওপর।

অন্য দিনের চেয়ে শতগুণে বেশী আঘাত লাগবে আজ সুধার মনে। অন্যদিন জানাই থাকত সুধার যে বাড়ী সে ফিরবে মদ খেয়েই, নতুন করে হতাশ হবার আশা করবার কিছু তার থাকত না। আজ সে আপিসে বার হবার সময়েও প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করেছে সুধার কাছে, সুধাকে বুকে নিয়ে আদর করতে করতে। সুধার কথা ভেবে মনটা কেমন করতে থাকে

অক্ষয়ের। সেই সঙ্গে সে অনুভব করে, ভেতরে গিয়ে এখন মদের গ্লাস হাতে নিলে তার সবটুকু শুচিতা, সবটুকু পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। সারাদিন রাজপথের ও দৃশ্য দেখার পর মদ খেলে বড়ই নোংরামি করা হবে সেটা।

তখন রাখাল বেরিয়ে আসে টলতে টলতে।

আহা, বেশ বেশ, রাখাল বলে অক্ষয়ের কাঁধে হাত রেখে গলা জড়িয়ে ধরে, কোথা ছিলে চাঁদ এতক্ষণ?

আঃ, রাস্তায় কি করো এসব?---রাখাল হাতটা তার ছাড়িয়ে দেয়।

বটে? চোখ বুঝি সাদা? বেশ বেশ। আমার বাবা চলছে সেই তিনটে থেকে, চোখ বুজে নিশ্বাস ফেলে রাখাল আবার চোখ মেলে তাকায়, হাঁ কথা আছে তোমার সঙ্গে। ভারি দরকারি কথা। সেই থেকে হাপিত্যেশ করে বসে আছি কখন আসে আম্মাদের অক্ষয়বাবু। চীনা ওটাতেই যাবে তো? চলো যাই। বসে বলব।

আমার টাকা নেই।

টাকা? টাকার জন্য ভাব্‌ছ? কত টাকা চাও?

রাখাল সত্য-সত্যই পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে গুণতে আরম্ভ করে। দু'তিন বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সমস্ত তাড়াটাই অক্ষয়ের হাতে তুলে দেয়।

নাও বাবা, তুমিই গোণ। তোমার ভাগ তুমি নাও, আমার ভাগ আমায় দাও। ঠকিও না কিন্তু বাবা বলে রাখছি।

কিসের টাকা?

অ্যাঁ? ও হ্যাঁ, বলিনি বটে। বললাম না যে তোমার সঙ্গে কথা আছে? চৌধুরী কমিশনের টাকা দিয়েছে--গিয়ে চাইতেই একদম ক্যাশ। বড় ভাল লোক। টাকার জন্য ভাবছিলে? নাও টাকা। দাঁড়িয়ে কেন বাবা? চলো না এগোই। ওখানে গিয়ে ভাগ হবে'খন।

সাদা চোখে কোনদিন রঙীন অবস্থায় রাখালকে দেখেনি অক্ষয়। দুজনে হয় তো মিলেছে সাদা চোখেই, তার পর রঙ চাপিয়ে গেছে সমান তালে। মদ খেলে রাখাল যে এরকম হয়ে যায়, একসঙ্গে এতদিন মদ খেয়েও অক্ষয়ের তা জানা ছিল না। এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় কত দিন রাখালকে সে ধরে সামলে ট্যাক্সিতে তুলে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছে বটে, কিন্তু তখন সে নিজেও হয়ে যেত অন্য মানুষ। এই রকম হত কি সে? এখনকার এই রাখালের মত?

কাল আমার ভাগ দিও।

নোটের তাড়াটা নিয়ে পাঞ্জাবী উঁচু করে [illegible]রের উলের জামাটার পকেটে রেখে রাখাল হাসে, কাহিল অবস্থা বুঝি? কোথায় টানলে আমায় ফাঁকি দিয়ে, এ্যাদ্দিনের পেয়ার আমি?

আর এক মুহূর্ত এ লোকটার সঙ্গে থাকলে সে সোজাসুজি হার্ট ফেল করে মরে যাবে, এই রকম একটা যন্ত্রণা হওয়ায় অক্ষয় মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে জোরে জোরে। তেরাস্তার মোড়টা পেরিয়ে আপিসের পথ ধরে চলতে চলতে তালা লাগানো গেটটার সামনে থামে। ওরা কি করছে একবার দেখতে হবে।

দেখতে যদি হয়, তেতালার ব্যালকনীতে উঠে একটা অংশকে মাত্র দেখবে দূর থেকে? রাস্তা ধরে ওদের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ওরা কি করছে দেখতে বাধা কি? মনমোহনের সঙ্গেও হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে।

অথবা বাড়ী যাবে?

এখন শান্ত হয়ে গেছে হৃদয় মন। প্রতিটি ছোট বড় কাজে কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় চিন্তার উদ্‌ভ্রান্ত জটিলতায় পাক খেতে খেতে প্রাণান্ত হওয়ার বদলে এমন সহজ হয়ে গেছে সাধারণ স্বাভাবিক বাস্তব সিদ্ধান্তে আসা। ওখানে গিয়ে ওদের মাঝখানে বসবে না বাড়ী যাবে—প্রশ্ন এই। এর জবাবটাও সহজ। এখন ওখানে গিয়ে হাঙ্গামা বাড়াবার কোন দরকার নেই তার, তাতে কারো উপকার হবে না, তার নিজের খেয়াল তৃপ্ত করা ছাড়া। বাড়ী যাওয়াও তার বিশেষ দরকার। সুতরাং বাড়ীই সে যাবে।

তবে ওরা কি করছে, কি অবস্থায় আছে, একবার না দেখে গেলে তার চলবে না। গায়ের আলোয়ানটাও দিয়ে যেতে হবে।

বাড়ী পৌঁছানো পর্য্যন্ত শীতে একটু কষ্ট হবে তার, কিন্তু বাড়ীতে বাকী রাত তার কাটবে লেপের নীচে। ওরা খোলা আকাশের নীচে পথে কাটিয়ে দেবে রাতটা। আলোয়ানটাতে যদি এক জনেরও শীতের একটু লাঘব হয়।

অমৃত মজুমদার তার বালীগঞ্জের বাড়ীতে ফিরে আসে রাত প্রায় দশটার সময়। বিষণ্ণ, হতাশ, গম্ভীর, পরিশ্রান্ত এবং দিশেহারা অমৃত মজুমদার। ছাত্রদের বসন্ত রায়ের বাণী শোনবার জন্য পুলিশ-লরীতে ওঠবার সময় তার রীতিমত কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু নামবার সময় কি করে যেন ব্যথা লেগেছিল বাঁ দিকের কুঁচ্‌কিতে। বিশেষ কিছু নয়, তবু ব্যথা তো। বাঁ হাঁটুর বাতের ব্যথাটাও আছে খানিক খানিক। এসব জিমন্যাষ্টিক কি পোষায় তার? কি যেন হয়েছে দেশে। এত-কাল রাজনীতি করে এসেও আজ যেন তার ধাঁধাঁ লেগে যাচ্ছে, ব্যাপারটা বুঝেই উঠতে পারছে না হঠাৎ কোন্ দিকে গতি নিচ্ছে রাজনীতি। কোন হলে বা পার্কে মিটিং কর, বক্তৃতা করবে। সংগ্রামের আহ্বান এলে তখন সংগ্রাম করবে। মোটরে গিয়ে মঞ্চে উঠে যা করার করা যায় সে অবস্থায়। তা নয়, রাস্তায় ওরা এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে যে, লরীতে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়।

সে কথা শোনে না পর্য্যন্ত কেউ।

কি হল? সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে মিসেস অরুণা মজুমদার, বলবার সুযোগ দিয়েছিল তো তোমাকে?

সব বৃত্তান্ত শুনে অরুণা তার রোগা কয়া মোটা দেহটি সোফায় এলিয়ে দিয়ে গভীর হতাশার সঙ্গে বলে, তুমি একটা পাগল, তুমি একটা ছাগল। তুমি কোনদিন কিছু করতে পারবে না।

আমি কি করব? বসন্ত বাবু গেলেন না—

অরুণা ফোঁস করে ওঠে মনের জ্বালায়, বসন্ত বাবু যে গেলেন না, সেটা যে তোমার কত বড় সুযোগ একবার খেয়ালও হল না তোমার? একবার মনেও হল না এই সুযোগে একটু চেষ্টা করলে এক রাত্রে তুমি নেতা হয়ে যেতে পার? একেবারে ফাঁকা ফিল্ড পেলে, কেউ তোমার কম্পিটিটর নেই, আর তুমি কিছু না করেই চলে এলে? তুমি সত্যি পাগল। সত্যি তুমি ছাগল। তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না, কোনদিন কিছুহবে না।

আমার কি করার ছিল?

আমি বলে দেব তোমার কি করার ছিল? ফুঁসতে থাকে অরুণা ক্ষোভে দুঃখে, তুমি না দশ বছর পলিটিকস্ করছ? তুমি না সব জানো সব বোঝ, অন্যে তোমার বুদ্ধি ভাঙ্গিয়ে খায়? একবার উঠতে পারলে সারা দেশটাকে মুখের কথায় ওঠাতে বসাতে পার? আমার কাছে যত তোমার লম্বা-চওড়া কথা, বন গাঁয়ে শ্যাল রাজা। সবাই ওঁকে দাবিয়ে রাখে তাই উনি

উঠতে পারলেন না, নাম-করাদের তাঁবেদার হয়ে রইলেন। নিজের বুদ্ধি নেই, ক্ষমতা নেই, অন্যের দোষ।

অমৃতের ফাঁপড় ফাঁপড় লাগে, দশ বছরের বিফলতা বাতাসকে যেন ভারি করে দিয়েছে মনে হয়। কতভাবে কত চেষ্টা করল, কত চাল কত কৌশল খাটাল, মরিয়া হয়ে কত আশায় জেলে গেল, কিন্তু না হল নাম, না জুটল প্রভাব প্রতিপত্তি, বড় নেতা হওয়ার সৌভাগ্যও হল না এতদিনে। পাণ্ডাদের সঙ্গে মিলতে মিশতে পায়, সাধারণ বৈঠকে যোগ দিয়ে কথা বলতে পায়, সভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে দু'চার মিনিট বলতেও পায়---তেমন সভা হলে বেশীক্ষণ। পরদিন খবরের কাগজ কেনে অনেকগুলি, সাগ্রহে সভার বিবরণ পাঠ করে। নিজের নাম খুঁজে পায় না কোথাও। যদি বা পায়, সে শুধু আরও নামের সঙ্গে উল্লেখ মাত্র।

অরুণার সঙ্গে তর্ক বৃথা। কিন্তু কিছু তাকে বলতেই হবে, না বলে উপায় নাই।

কথাটা তুমি বুঝছো না, অমৃত বলে কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুরে, পাণ্ডারা যা ঠিক করলেন তার বিরুদ্ধে কি যাওয়া যায়? আমার নিজের কিছু করতে যাওয়া মানেই ওঁদের বিরোধিতা করা। ওঁরা চটে যাবেন না তাতে? আমাকেই তো পাঠালেন বাণী দিয়ে, সেও তো একটা বড় সম্মান? কত বিশ্বাস করেন বলতো আমাকে। এতবড় একটা দায়িত্ব---

এরকম দায়িত্ব পালনের অনুগত ভক্ত না থাকলে কি পাণ্ডা-গিরি চলে?

বীণার এই ঘরে ঢোকার মন্তব্য আরও কাহিল করে দেয় অমৃতকে। মায়ের মতই হয়ে উঠেছে মেয়েটা। স্বামী পায় নি এখনো, বাপের ওপরেই কথার ঝাল ঝাড়ে।

চুপ কর বীণা। যা এ ঘর থেকে। অরুণা ধমক দেয়। বীণা অবশ্য যায় না। সে বুঝতে পারে, মার সঙ্গে বাবার খাঁটি বিবাদ বাধে নি, বাবাকে দিয়ে মা কিছু করিয়ে নিতে চান। লাগাম চাবুক সব তাই মা সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে রাখতে চান, অন্য কারো এতটুকু হস্তক্ষেপ তাঁর পছন্দ নয়। বীণা তাই একটু তফাতে চুপ-চাপ বসে পড়ে।

এবার কথার ঝাঁঝ বাদ দিয়ে গম্ভীর ভাবে অরুণা বলে স্বামীকে, ওটা কর্ম্মীর দায়িত্ব। তুমি তবে দুঃখ কর কেন? বিশ্বাসী দায়িত্ববান্ কর্ম্মীর সম্মান তো পাচ্ছ। নেতা হবার সখ কেন তবে?

কি জানি।

যাক গে। এবার পলিটিকস্ ছেড়ে দাও। কাজ নেই আর তোমার পলিটিক্স করে। ওসব তোমার কাজ নয়। মুখ হাত ধুয়ে এসো।

কি বলতে চাও তুমি? স্ত্রীকে নরম দেখে অমৃত এবার ক্রুদ্ধ হয়ে, তোমরা ভাবো আমি বোকা, হাবা গোবেচারী ভাল

মানুষ, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানি না। এ বাড়ী করেছে কে? ঠাকুর, চাকর, দরোয়ান নিয়ে শাড়ী গয়না পরে এত যে আরামে আছো তোমরা—

বীণা? অরুণা বলে দৃঢ়স্বরে, তোর এত রাত হল কেন বাড়ী ফিরতে? কোথা গিয়েছিলি?

বীণা জবাব দেয় না। সে জানে এটা আসলে তার বাবার কথার জবাব, বাবাকে ধমক দিয়ে চুপ করানো। নইলে বাড়ী ফিরতে এমন কিছু রাত তার হয়নি যে কারণ জানবার জন্য মা মাথা ঘামাবে। অমৃত একটা চুরুট বার করে ধরায়। অরুণা কি হাল ছাড়ল? বাইরের জগৎ থেকে জীবনকে এবার সে ঘরের সীমায় এনে রাখবে ঠিক করেছে? অথবা আরও কিছু বলার আছে তার?

ঠিক বুঝে উঠতে পারে না বলে অমৃত আবার পুরাণো কথাটাই জিজ্ঞেস করে, আমার কি করার ছিল?

তোমার? তোমার বোঝা উচিত ছিল দশ বছর যে সুযোগ খুঁজছ এ্যাদ্দিনে তা এসেছে। বড়রা কেউ হাজির নেই গুলি-গোলার ভয়ে, তুমি যা বলবে তুমি যা করবে কেউ তা ভেস্তে দিতে পারবে না। বাণী যখন ওরা মানল না, তোমার উচিত ছিল ঘোষণা করা যে তুমি ওদেরি পক্ষে। জোর গলায় বলা উচিত ছিল, দশ বছর পনের বছর দেশের সেবা করছ, জেল খাটছ, কিন্তু আদর্শের চেয়ে বড় কিছু নেই তোমার। তাই,

তুমি দায়িত্ব নিচ্ছ মিটমাটের, ব্যবস্থা করার, এ জন্য যদি প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তোমাকে—

কিসের মিটমাট? অমৃত বলে আশ্চর্য্য হয়ে।

তা দিয়ে তোমার কি দরকার? তুমি দায়িত্ব নিতে মিটমাটের—মিটমাট হোক বা না হোক তোমার কি এসে যায়? ওদের সঙ্গে কথা বলতে, অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে, এদিক্ ওদিক্ ছুটোছুটি করতে, বাস্, তোমার কাজ হয়ে গেল। দুদিন পরে দেশের লোকের মনের গতি বুঝে অবস্থা বিবেচনা করে তুমি জোর গলায় বলতে, তুমিই বিপদ ঠেকিয়েছ, তুমিই আন্দোলনটা সফল করেছ, তুমিই চেষ্টা করেছ দাবী আদায়ের।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে অমৃত। আগেও অনেকবার তার মনে হয়েছে, আজও মনে হয়, অরুণাকে সামনাসামনি পলিটিক্সে নামিয়ে সে যদি পিছনে থাকত, এতদিনে হয় তো প্রবল প্রতিপত্তি আয়ত্ত করা যেত রাজনীতির ক্ষেত্রে। নিজে দেশ-নেতা না হতে পারলেও অন্ততঃ দেশনেত্রীর স্বামী হওয়া যেত।

এখনো সময় আছে।

অরুণার মৃদু, সংক্ষিপ্ত, সুদৃঢ় ঘোষণায় হৃৎকম্প হয় অমৃতের।

এখুনি তুমি যাও আবার, অরুণা বলে উৎসাহের সঙ্গে, পাণ্ডারা শুয়ে শুয়ে ঘুমোক। গিয়ে পুলিশকে বলবে তুমি মিটমাট করতে এসেছ, সবাইকে বাড়ী ফিরে যাবার আবেদন

জানাবে। তাহলে বলবার সুযোগ পাবে। কিন্তু খবর্দ্দার, বলতে উঠে যেন ওদের শান্ত ভাবে বাড়ী ফিরে যেতে বোলো না। ওদের বীরত্বের প্রশংসা করে, ওরাই যে দেশের ভবিষ্যৎ, এ সব কথা বলে আরম্ভ করবে। তারপর খুব ফলাও করে বলবে ওদের দাবী যাতে মেনে নেওয়া হয় সেজন্য তুমি কত ছুটোছুটি করেছ। বলবে, ভাই সব, তোমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গুলির সামনে বুক পেতে দেবার গৌরব আমার জুটল না, কারণ বিদেশী সরকারের গুলি যাতে আমার দেশের ভাইদের বুকে না লাগতে পারে, সেই চেষ্টা করাই বড় মনে হয়েছিল আমার। তোমাদেরি বাঁচাতে চেয়েছিলাম আমি। গুলি যখন চলেছে, তোমাদের যখন বাঁচাতে পারি নি, তখন আজ থেকে, এই মুহূর্ত্ত থেকে আমার জীবনপণ ব্রত হল দেশকে স্বাধীন করা। তোমরা অনেক বক্তৃতা শুনেছ, আমি ভাল বক্তৃতা দিতে পারি না, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ভাই সব, বক্তৃতার দিন আর নেই, এখন আমরা সবাই মিলে—

অরুণা অসহায়ের মত হঠাৎ থেমে যায়। চল্লিশ কোটি কালো নরনারী তার বক্তৃতা শুনছিল। হঠাৎ সামান্য একটা কারণে, নিজের মুখ থেকে বার করা "সবাই মিলে" কথাটার প্রতিক্রিয়াগত সাংঘাতিক আঘাতে সে মরণাপন্নের মত পাংশু হয়ে যায়। স্বামীর জীবনকে সার্থক করা গেল না। ঘরে বসে তাকে যদি বক্তৃতা শেখাতে হয় স্বামীকে, এতক্ষণ শেখাবার

পর এখন যদি আবার বলে দিতে হয় নিজের কথা সংশোধন করে যে, না, সবাই মিলে এ কথাটা বোলো না, তবে সে কি করতে পারে, সামান্য সে মেয়ে মানুষ।

এতক্ষণ পরে বীণা কথা বলে, কি হল মা? তোমার সেই হার্টের ব্যথাটা হয় নি তো?

ডাক্তার বছর দেড়েক আগে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে গিয়েছিলেন অরুণার হার্টের ব্যথাটা আবার যদি জাগে জীবনের সহজ নিয়ম রীতিনীতি পালন না করার জন্য, তবে জগতের কোন ডাক্তার এ দায়িত্ব নিতে পারবেন না যে, হার্টফেল করে মিসেস অরুণা মজুমদারের আকস্মিক মৃত্যু ঘটবে না।

আমি ঠিক আছি, অরুণা বলে যাবে তুমি? 'যাবে? পারবে এ সুযোগ নিতে? দশ বছর কাঙালের মত যা চেয়েছ, আজ তা আদায় করে নিতে পারবে? যাবে কিনা বলো।

যাচ্ছি যাচ্ছি, অমৃত বলে, এখুনি যাচ্ছি।

বীণা, হালিমকে বল গাড়ী বার করুক—এই দণ্ডে। খেতে বসে থাকলে বলবি পেঁৗছে দিয়ে এসে খাবে। যদি না ওঠে, কাল থেকে বরখাস্ত। যাও না তুমি? দশ বছরে মুটিয়েছ বেলুনের মত, একটা দিন একটু খাটো?

যাচ্ছি, যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি, বলে অমৃত।

হালিম খেতে বসেনি। তার যৌবনান্তের দিনগুলিতেও অনেক সমস্যা। আজ সে অনেক ঘুরেছে গাড়ী নিয়ে—

এত পেট্রোল বাবু কোথা থেকে যোগাড় করেন তার মাথায় ঢোকে না। বড় বড় লোকের সঙ্গে কারবার বাবুর, বাবুর কথাই বোধ হয় আলাদা। অন্যদিন হয়তো রাগ করত হালিম এত খাটুনির পর আবার এখন গাড়ী বার করবার হুকুম শুনলে, আজ সে কথা কয় না, অমৃতকে নিয়ে অসম্ভব স্পিডে গাড়ী চালিয়ে দেয়।

বাড়ীতে বীণা তখন বলছে ব্যাকুলভাবে, মাগো, ওমা, কি হল তোমার? কেন এমন করছ? ওমা, মা—

ডাক্তার বার বার বলেছিল, সাবধান, সাবধান। এ কোন্ মরীচিকার লোভে মা সে কথা ভুলে গেল! নিজের মরণ ডেকে আনবার মায়ের এই অদ্ভুত পাগলামীর কথাই বীণা ভাবে ভাই বোনের সঙ্গে মায়ের মৃতদেহ আগলে বাপের প্রতীক্ষায় বসে থেকে। খাওয়া দাওয়ার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে এমন নিখুঁত সতর্কতা, মনে এত উদ্বেগ অশান্তি ক্ষোভ জমা করবার কি দরকার ছিল? এত পেয়েও সাধ মিটল না, যশ মান প্রতিপত্তির উগ্র কামনায় পুড়তে পুড়তে মরতে হল শেষে? ক্রমে ক্রমে যেন পাগল হয়ে উঠেছিল মা তার বাবাকে বড় একজন নেতা করার জন্য। এতই কি প্রচণ্ড নেতৃত্বের মোহ মানুষের যে বাবার জীবনটা তার ভরে ওঠে আত্মগ্লানি আর হতাশায় তবু তিনি থামতে পারেন না, মাকে তার জীবনটা দিতে হয়। মা যেন তার আত্মহত্যা করেছে মনে হয় বীণার। নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা

গড়িয়ে পড়তে থাকে বীণার গাল বেয়ে, ভাই বোনদের মত সে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে না।

এদিকে গাড়ীর গতির মতই দ্রুত হয়ে ওঠে অমৃতের চিন্তার গতি। তাড়াতাড়ি মনে মনে সে আউড়ে নিতে থাকে ওখানে গিয়ে কি বলবে আর কি করবে, কোন্ কৌশলে কাজ হবে বেশী। অনেক দিন পরে হঠাৎ আজ যেন তার আত্মবিশ্বাস সজীব হয়ে উঠেছে মনে হয়, বেশ খানিকটা সে উত্তেজনা বোধ করে। অরুণা ঠিক কথাই বলেছে, এসব সুযোগকে কাজে লাগিয়েই মানুষ জনসাধারণের মনে আসন পাতে, নেতা হয়। নানা সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে যেতে থাকে অমৃতের মনে। একটা চিন্তা তাকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে তোলে, লোভ ও ভয়ের আলোড়ন তুলে দেয়। একটা কাজ সে করতে পারে, অতি চমকপ্রদ নাটকীয় একটা কাজ, সাধারণের মনকে যে ধরণের ব্যাপার প্রবলভাবে নাড়া দেয়। আজকের ঘটনা নিয়ে সে আন্দোলন করবে, একথা সে জানাবে। কিন্তু আরও সে এগিয়ে যেতে পারে। সে ঘোষণা করতে পারে যে গুলি-চালনার প্রতিবাদে এবং ওদের দাবীর সমর্থনে এখন এই মুহূর্তে সে ওদের সঙ্গে যোগ দিল— তারপর ওদের মধ্যে গিয়ে পথে বসে পড়তে পারে। পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে তাকে। তাহলে তো আরও ভাল হয়।

চারিদিকে সাড়া পড়ে যাবে তাকে নিয়ে। কাগজে বড় বড় হরপে তার নাম বেরোবে—

বেরোবে কি? এই বিষয়েই মস্ত খটকা আছে অমৃতের মনে। নিজে নিজে সে এতখানি এগিয়ে গেলে বড়রা চটবেন সন্দেহ নেই। সে আন্দোলন করবে, ওদের হয়ে লড়বে, এইটুকু ঘোষণা করার জন্যই চটবে। ওরা চটলে কোন বড় কাগজে তার নাম বেরোবে না। সে নিজে কোন বিবৃতি দিলে তাও ছাপা হবে না। তারপর, সে যদি একেবারে রাজপথে গিয়ে বসে পড়ে ওদের মধ্যে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, রাগে হয়তো চোখে অন্ধকার দেখবেন চাঁইরা। আজকের ঘটনাকে তাঁরা কি ভাবে নেবেন, কি ভাবে নিতে বাধ্য হবেন, এখন সঠিক অনুমান করে বলা যায় না। কিন্তু বড়দের মনোভাবের খানিকটা ইঙ্গিত আজকেই অমৃত পেয়েছে। ওঁরা যতটা সম্ভব উদাসীন থাকতে চান, ঘটনাটিকে বেশী গুরুত্ব দিতে চান না। এই দলাদলির দিনে কোন একটি বিশেষ-দলের বাহাদুরী নেবার চেষ্টা বলে হয় তো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবেন। তাহলেই বিপদ অমৃতের। হয়তো তাকে দল থেকে রিজাইন দিতে হবে। নয় তো আজকের প্রকাশ্য ঘোষণা হজম করে ফেলে সরে দাঁড়িয়ে তলিয়ে যেতে হবে তলে।

কিন্তু কথাটা হল কি—অমৃত হিসাব কষে যায় প্রাণপণে মাথা ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করে—যে বিপদ নয় ঘটল, নেতারা নয়

বর্জন করলেন তাকে, অন্যদিকে লাভ হবে নাকি কিছুই? হৈ চৈ কি হবে না তাকে নিয়ে? অন্য দলে গিয়ে কি করতে পারবে না কিছু? এতকাল নেতাদের মুখ চেয়ে থেকে তো কিছু হল না, সরে গিয়ে অন্য চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি? কিন্তু সে সুযোগ যদি না পায়? যদি ফসকে যায় তার আজকের রাজনৈতিক ষ্ট্র্যাটেজি? তখন এদিকও যাবে, ওদিকও যাবে।

নরম ঘোষণাটা জানিয়ে বাড়ী ফিরে গেলে পরিস্থিতি যাই দাঁড়াক সে সামলে নিতে পারবে। কিন্তু গরম ঘোষণা আর চরম কাজটার মত ফল তাতে হবে না---ওতে একরাত্রেই হয় তো সে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হয়ে যেতে পারে। কি করবে ঠিক করে উঠতে পারে না অমৃত। অরুণা কাছে নেই বলে বড় তার আপশোষ হয়। অরুণার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে পেলে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলা যেত!

পাশের রাস্তা দিয়ে মোড়ের কাছাকাছি এসে অমৃতের গাড়ী থামে। ভিড় এখন বিশেষ নেই। অমৃত গাড়ী থেকে নেমে চলতে আরম্ভ করেছে, বোতাম খোলা কোট গায়ে লম্বা একটি যুবক এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ায়।

অমৃত বাবু, একটা কথা আছে।

আপনাকে তো---?

আমায় চিনবেন না। আপনার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আপনি এখুনি বাড়ী ফিরে যান। আপনার বাড়ী

থেকে টেলিফোনে খবর পেয়ে সুব্রত এসেছিল—আপনার মেয়ে টেলিফোন করেছিলেন। আপনাকে জানাতে বলে সুব্রত আপনাদের বাড়ী চলে গেছে।

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? কি হয়েছে? কিন্তু আমি যে এদিকে—

অমৃতের অনিচ্ছুক, ইতস্ততঃ ভাব অদ্ভুত লাগে মনমোহনের। তারপর সে ভাবে, তার কথা থেকে অমৃত হয়তো খবরটার গুরুত্ব ধরতে পারেনি। সে বলে, হঠাৎ হার্টের এ্যাটাক হয়েছে শুনলাম। অবস্থা ভাল নয়। আপনি এখুনি চলে যান।

হার্টের এ্যাটাক অরুণার পক্ষে মারাত্মক হওয়া আশ্চর্য্য নয়। বাড়ী থেকে বেরোবার সময় তাকে সুস্থ দেখেছিল বটে, কিন্তু হার্টের ব্যাপার হলে দু'-চার মিনিটে অবস্থা খারাপ দাঁড়ানো সম্ভব। কিন্তু এদিকের ব্যবস্থা তবে কি করা যায়? চরম সিদ্ধান্তটা আজ তবে বাদ দিতেই হল। তাড়াতাড়ি তার কথাগুলি বলে নিয়ে বাড়ীই তাকে ফিরে যেতে হবে। অরুণার অসুখের কথাটাও উল্লেখ করে বলতে পারবে যে, ওদের এ অবস্থায় রেখে ফিরে যেতে তার প্রাণ চাইছে না, কিন্তু স্ত্রীর কঠিন অসুখের জন্য একান্ত নিরুপায় হয়েই—

আমি কিছু বলতে এসেছি আপনাদের। মিনিট দশেক বলেই শেষ করে বাড়ী যাব।

আপনাদের কোন অ্যানাউন্সমেণ্ট?

ঠিক তা নয়, আমি নিজেই কিছু বলব। দেশজোড়া একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এ ব্যাপার নিয়ে, আমি বলে দিতে চাই যে, সে আন্দোলন গড়ে তুলতে আমার যতখানি ক্ষমতা আছে সব আমি কাজে লাগাব।

নিজেকে হঠাৎ বড় শ্রান্ত মনে হয় মনমোহনের। অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে ভাষা ও গলার গুরুত্বপূর্ণতা বজায় রেখে সে বলে, এখন বলা কি ঠিক হবে? কেউ বক্তৃতা শোনার মতো অবস্থায় নেই। কাল মিটিং হবে, সেখানে বলাই ভাল হবে।

আমায় বলতে দেবেন না তা হলে?

বলতে চাইলে বাধা দেব কেন? বলা উচিত কি না আপনিই বুঝে দেখুন। আমাদের মরাল ঠিক আছে, আপনার বক্তৃতার ফলে বড় জোর কয়েকজনের উত্তেজনা বাড়বে। তার চেয়ে আপনি যদি কাল পাবলিকের কাছে বলেন আপনার কথা, তাতে বেশী কাজ হবে।

বাড়ীতে ও গাড়ীতে যে উৎসাহ ও উত্তেজনা বেড়ে উঠেছিল, এখন তা অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে অমৃতের কেমন অস্বস্তি বোধ হয়, একটু ভয়ও করে। সশস্ত্র আক্রমণ ও নিরস্ত্র প্রতিরোধের যে সঙঘর্ষ হয়ে গেছে তারি আলোয় এখনকার শান্ত পরিস্থিতিকেও অমৃতের অপরিচিত, ধারণাতীত মনে হয়। সে অনুভব করে, তার এতদিনকার

অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খায় না আজকের অবস্থা, তার জানা-শোনা ধরা বাঁধা পুরাণো নিয়মে আজকের ঘটনা ঘটে নি। তার পক্ষে এই অবস্থার সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিন---হয়তো অসম্ভব।

ফিরে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসে নিজেকে অমৃতের মৃত মনে হয়।

হালিম জোরে চালাও।

মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে অমৃতের, চোখের সামনে কতগুলি তারা ঝিকমিক করে ওঠে।

একটু দূরে দূরেই থাকে সঞ্জয়, তফাৎ থেকে উদাসীনের মত দ্যাখে। মনে তার নালিশ নেই, ক্ষোভ জমা হয়ে আছে প্রচুর। তার উনিশ বছরের মনটা অভিমানে জর্জর।

ওরা শোভাযাত্রা করে এসে বাধা পেয়ে এখানে বসেছে রাস্তায়, এই নতুন উত্তেজনায় আরও মজাদার হয়েছে ওদের দল বেঁধে রাস্তায় নেমে মজা করা। বেশ খানিকটা হৈ চৈ হবে চারিদিকে এই ব্যাপার নিয়ে। বড় বড় লোকেরা ছুটাছুটি করবে বড় কর্ত্তাদের কাছে, আলাপ আলোচনা চলবে কিছুক্ষণ তারপর মিটমাট হবে আপোষ মীমাংসায়। গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে বাড়ী ফিরবে সবাই, আত্মীয়বন্ধু পাড়াপড়শীর কাছে, মেসে হোটেলে চায়ের দোকানে, সচকিতা মেয়েটির কাছে, বলে বেড়াবে ওরা কি ভাবে সংগ্রাম করেছে,---সংগ্রাম! আটমাস

আগে হলে সেও যেমন হয় তো থাকতো ওদের মাঝে, বাড়ী গিয়ে মাধুকে শোনাত সংগ্রামের কাহিনী, চোখ বড় বড় করে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকত মাধু!

আজ সে ওদের মধ্যে নেই। সে আর কলেজের ছেলে নয়। হাজার দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যেও হাসিখুসী আশা স্বপ্নের ওই নিশ্চিন্ত সুখের জীবন তার ফুরিয়ে গেছে, শোভাযাত্রা করে এসে লাঠি বন্দুকের বাধা মানবো না বলে রাস্তায় বসে পড়ার মজা আর তার জন্যে নয়। সে এখন চাকুরে, কেরাণী! মাস-কাবারী চল্লিশ টাকা বেতনটাই এখন তার আশা আনন্দ ভবিষ্যৎ---হাওড়ার ওই বস্তি-ঘেঁষা নোংরা পুরাণো ভদ্রপল্লীর ওই টিনের চাল মাটির দেয়াল আর লাল সিমেণ্টের মেঝেওয়ালা বাড়ীটার অংশটুকুতেই আটকে গেছে জীবন তার চিরদিনের জন্য, এই ঘরে-কাচা আধময়লা জামা কাপড় আর সস্তা ছেঁড়া রঙচটা আলোয়ানটি তার শুধু বেশভূষা নয়, আগামী পরিচয়ও বটে।

এমনি লোকও বহু জুটেছে ওদের সঙ্গে, পথের রাজপথের সাধারণ পথিক। তার চেনা ওই ছোকরা পর্য্যন্ত দলে ভিড়েছে, আপিসের সামনে বিড়ির দোকানে যাকে সে বিড়ি বানাতে দেখে আসছে গত কয়েক মাস। তবু অভিমান নরম হয় না অজয়ের। পথিকেরা ভিড় করেছে মজা দেখতে, কৌতুহলের বশে। ওদের মধ্যে গিয়ে ভিড়লে তাকেও ওরা ভাববে দলের বাইরের ওই রকম কৌতুহলী পথিক, ওদেরি মত সেও যে ছিল

কলেজের ছাত্র মাত্র কয়েক মাস আগে, এ পরিচয় ঘোষণা করলেও ওরা তাকে আপন ভাবতে পারবে না। সে আর ছাত্র নেই, সে পর হয়ে গেছে। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার দাবী তার নেই।

একটা বিড়ি টানতে ইচ্ছা করে। সঙ্গে নেই, কিনতে হবে।

বন্ধুদের কাছে সিগারেট মিলত, তার সঙ্গে নিজে দু'একটা কিনে চালিয়ে দেওয়া যেত একরকম। একটা সিগারেট তিনবারও ধরানো যায় নিভিয়ে রেখে রেখে। চাকরী নিয়ে পাঁচটা করে সিগারেট কিনছিল রোজ নিজের রোজগারের পয়সায়, কম দামী সিগারেট, পাঁচটা মোটে দু' আনা—এক বাণ্ডিল বিড়ির দাম। ছেড়ে দিতে হয়েছে। ট্রাম বাসের ক'টা পয়সা বাঁচাতে ব্রিজ থেকে যাকে হাঁটতে হয় আপিস পর্য্যন্ত, সে খাবে সিগারেট। বিড়ি ধরেছিল, ঘেন্নায় তাও ছেড়ে দিয়েছে। সিগারেট টানবার সাধ নিয়ে ক্ষমতার অভাবে টানতে হবে বিড়ি। ধোঁয়া খাওয়াই বন্ধ থাক তার চেয়ে।

মাধু বলেছিল শুনে, লাটসায়েবের মত একটা বাড়ীতে থাকতে সাধ যায় না?

না।

মিথ্যে বোলো না।

সাধ আর স্বপ্নের তফাৎটা মাধু এখনো বোঝে না, এটাই আশ্চর্য্য। পেট ভরে ভাত খাওয়াও যেন সাধ, পোলাও

খাওয়াও তাই। অথচ ওর বোঝা উচিত। দুটো পয়সা রোজগারের উপায় খুঁজে ছটফট করছে।

আঙুলে ধরা সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে, টানতেও যেন আলস্য লোকটার। দাঁড়াবার ভঙ্গিটাও আলসেমিতে ঢিল। কি হয় দেখবার জন্য দাঁড়িয়েছে কিন্তু আগ্রহের অভাবটা এমন স্পষ্ট! পাতলা পাঞ্জাবীর পকেটে সিগারেটের রঙীন টিনটা দেখা যায়!

বিড়ি এক পয়সার কিনে একটা খেলে দোষ নেই। সাধ মিটিয়ে সিগারেট খাবার ক্ষমতা না হলে সিগারেট ছোঁবে না প্রতিজ্ঞা করেছে, বিড়ি কখনো খাবে না তা বলেনি নিজেকে। এমন বিশ্রী লাগছে ওদের দূরে থেকে দলভ্রষ্ট জাত নষ্ট পতিতের মত দাঁড়িয়ে থাকতে! একটা বিড়ি টানলে হয় তো একটু ভাল লাগত!

আজ নিয়ে পাঁচ দিন হল বিড়ি খায় না। বেশ কষ্ট হয়েছে না খেয়ে থাকতে, এখনো কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। খাবার ইচ্ছাটাও যে বেশ জোরালো আছে এখনো, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। একটা বিড়ি খেয়ে পাঁচ দিনের লড়াইটা বাতিল করে দেবে! যাকৃগে। কি হয় বিড়ি না খেলে!

বাবু? বাবু, শুনছেন? শিয়ালদ' যামু ক্যামনে?

এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, অজয় ভাবে। গাঁ থেকে যত গেঁয়ো মানুষ নতুন সহরে এসে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, সবাই

যেন তারা হাঁ করে থাকে কখন অজয়বাবুর দেখা মিলবে, তাকে জিগ্যেস করে হদিস্ মিলবে পথঘাটের, মুস্কিলের আসান হবে। কিছু জানবার থাকলে ভদ্রলোক তাকে এড়িয়ে জিগ্যেস করে অন্য লোককে, এরা সকলকে এড়িয়ে জিগ্যেস করে তাকে! এমন গেঁয়ো অস্ত্র চাষাভূষোর মতই কি দেখায় তাকে যে দেশ গাঁয়ের আপন লোক ভেবে ওরা ভরসা পায়? ঘোমটা টানা ছোট্ট একটি কলাবৌ আর মাঝবয়সী একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাশের রাস্তার খানিকটা ভেতরের দিকে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে লোকটি খানিকক্ষণ ধরে এদিক ওদিক এর ওর মুখের দিকে চাইছিল, এবার এত লোককে ডিঙ্গিয়ে তার কাছে এসেছে।

একটু ঘুরে যেতে হবে বাপু।

পথ আর উপায় বাতলে দেয় অজয়, লোকটি মাথা চুলকোয়।

এসো আমার সঙ্গে।

পাশের রাস্তা ধরে এগিয়ে ওদিকের মোড়ে রিক্‌সা ডেকে ওদের তুলে দিয়ে অজয় নিজেও একটু ইতস্ততঃ করে পথ-সংশয়ী পথিকের মত। বাড়ী ফিরবে না ওখানে ফিরবে? সে ওদের নয়, তার পথ নয় ওদের পথ।

ইচ্ছে কিন্তু করছে ফিরে যেতে, ওরা কি করে দেখতে, শেষ পর্য্যন্ত কি হয় সঙ্গে থেকে জানতে। পরের মতই না হয় সে দেখবে ওদের কার্য্যকলাপ, সে তো আর দাবী করছে না

যে, মোটে আট মাস আমি ছাপ হারিয়েছি, আমায় তোমাদের মধ্যে ঠাঁই দাও!

গুলির আওয়াজটা তখন সে শুনতে পায়, কাণে আসে তুমুল কলরব। সব ভুলে সে ছুটতে আরম্ভ করে, তার সমস্ত ক্ষোভ অভিমান পরিণত হয় একটিমাত্র ব্যাকুল প্রশ্নে, কি হল, কি হল? ভয়াতুর মানুষ ছুটে যায় তার পাশ কাটিয়ে বিপরীত দিকে, সে চেয়েও দেখে না। বরং তার একটা অদ্ভুত আনন্দ হয় যে এদের সংখ্যা বেশী নয়। দু'দশজন পালাক, সকলে কি করছে দেখতে হবে।

তফাতে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে সে ভুলে যায়, সোজা চলে যায় ওদের কাছে, ওদের মধ্যে।

মধুখালিতে তখন মাঝ রাত্রি পার হয়ে গেছে। গাঁয়ের পূর্ব প্রান্তের কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকার আগুনের শিখায় রক্তিম হয়ে উঠেছে। অল্প দূরে নদীর জলও লাল হয়ে গেছে উদয় রশ্মির ছোঁয়াচ লাগার মত। সমুদ্রের দিকে প্রায় এক মাইল নামায় নদীর ধারে কেশব বদ্যির ঘর, সেখান থেকে মধুখালির আগুন দেখা যায়।

গোঙাতে গোঙাতে যাদব বলে, গণশার মা, শুলে পারতে না একটু? রাণী তুই শো না একটু বাছা? কত কষ্ট কত হাঙ্গামা আছে অদেষ্টে এখনো ঠিক কি তার?

শুয়ে কি হবে? শুলেই ডাকবে, বলবে, চলো এবার। কপালে দুঃখু আছে তো আছে! গণেশের মা জবাব দিয়ে মস্ত হাই তোলেন, হাঁ বুজবার আগেই কাঁথাটা ঠিক করে দেন ছোট ছেলে দুটোর গায়ে। তারা অঘোরে ঘুমোতে আরম্ভ করেছে শোয়ার সুযোগ পাওয়া মাত্র।

রাণী উত্তরের বেড়ার জানালার ঝাঁপ উঁচু করে তাকিয়ে থাকে দূরের রক্ত-চিহ্নের দিকে। শুয়ে পড়ে একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্য যাদবের আবেদন তার কানে পৌঁচেছে মনে হয় না। তার শরীরের শিরা-মাংস মাটিতে আছড়ে পড়ে বিশ্রাম খোঁজার মত অবসন্ন, হঠাৎ হাঁটু ভেঙ্গে হয়তো সত্যি সত্যি পড়ে যাবে, কে জানে। কিন্তু দূরের ওই আগুনের রক্তিম সংকেত থেকে চোখ সরিয়ে নেবার ক্ষমতা তার নেই। সাদা চুণকাম করা মাটির দেয়ালের ওপরে সুন্দর করে ছাওয়া কয়েকটা চালা শুধু পুড়ছে না ওখানে, সীতা দেবীর অগ্নিপরীক্ষার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন দেবতারা তার সতীত্ব রক্ষার জন্য, একেবারে শেষ মুহূর্তে। হৈ হৈ রৈ রৈ আওয়াজ এসেছিল কাণে, মনে হয়েছিল দু'কানে এতক্ষণের ঝিম ঝিম আওয়াজ এবার বদলে গেল কানের পর্দা ফেটে মাথার ঘিলু বেরিয়ে আসছে বলে, এবার সে মরবে। যাক্ বাঁচা গেল, সে ভেবেছিল, মরার পর যা খুসী করুক তাকে নিয়ে বেঁটে মোটা লোকটা, সে তো আর জানবে না বুঝবে না! গাঁ শুদ্ধ লোক যে হৈ হৈ করে তাকে ছিনিয়ে

নিতে এসেছে রাবণের হাত থেকে তা কি সে জানত! বিশ্বাস করতে পারে নি, মনে হয়েছিল কোটালের জোয়ার বুঝি আসছে নদীতে, ও তারই গর্জন।

সে লোকটা কি পুড়ছে ওই আগুনে? ধীরে সুস্থে পোষাক ছেড়ে, তাকে বার বার ভয় নেই ভয় নেই বলতে বলতে, পা পর্য্যন্ত ঝোলা যে জামাটা গায়ে দিয়েছিল সেই জামা শুদ্ধু? রাণী জোরে নিশ্বাস টানে—ওখান থেকে এতদূরে ভেসে এসে যেন পোড়া মাংসের গন্ধ তার নাকে লাগা সম্ভব। সে যখন বেরিয়ে আসে পাগলের মত, কয়েকজন মিলে সেটাকে মারছিল তার মনে পড়ে। খুন করে কি রেখে এসেছে সেটাকে, ওরা চিতায় পুড়বার জন্য? বেঁধে কি রেখে এসেছে নেওয়ারের খাটটার সঙ্গে জ্যান্ত অবস্থায়? ইস্, একটু ধৈর্য্য ধরে সবাইকে বাইরে ডেকে সে নিজেই যদি বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সেটাকে সজ্ঞানে জ্যান্ত অবস্থায় আগুনে পুড়ে মরবার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসত।

ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া মুখে লাগছে। রাণীর শীতবোধ নেই। দূরে ওই অত্যাচারীর চিতার আগুনের তাপটাই সে অনুভব করছে, দেহমনের আর সব অনুভূতি মরে গেছে তার।

নিজে শীতে না কেঁপে, গণেশের মা বলেন যাদবকে, মোদের শোবার লেগে দশগণ্ডা হুকুম না ঝেড়ে, নিজে এসে কাত হও না একটু এদের পাশে কাঁথাটা গায়ে দিয়ে?

শোবার সময় এটা মোর আঁ?

বসে থেকে কি রাজ্য উদ্ধার করবে?---হাই চাপতে গণেশের মা রোগা হাতের মুঠিটাই ঘসতে থাকে হাঁএ, ভেবে কি হবে? ছেলেতো আছে সহরে, গিয়ে একবার পড়তে পারলে ভয়টা কি? নে যাবার সব তো করছে এরাই।

যাদব কথা কয় না।

একা তো নও আর? খুব তো সামলেছিলে মেয়াকে, বড়াই কত। সবার ঘরে মেয়ে বৌ, সবাই টের পেলে এমনি ব্যাপার চলতে দিলে আর বাঁচোয়া নেই, তাই না গেল সব মরিয়া হয়ে ছুটে। ধান-তোলা নিয়ে না লাগলে এমন ক্ষেপতনা লোক ---ভগমানের আশীর্ব্বাদ। মেয়াকে তোমার ছিনিয়ে আনলে, আগুন দিলে ঘাঁটিতে, হেথা সরিয়ে আনলে মোদের রাতারাতি, সহরতক পৌছে আর দিতে পারবে না? তুমি কোথা লাগবে উঠে পড়ে, তা নয়, ভয়ে ভাবনায় হাতপা সেঁধিয়ে বসে আছ পেটের মধ্যে!

ডিবরির শিখাটা অবিরত কাঁপছে উত্তরের হাওয়ায়। গণেশের মার রোগ-জীর্ণ শীর্ণ দেহটা দেখতে দেখতে বাতাসে সরু গেঁটে বাঁশের দোলন মনে পড়ে যাদবের। যে ঝড়ে ঘরের চালা উড়ে যায়, বড় বড় গাছ মট-মট ভেঙ্গে পড়ে, সেই ঝড়েও গেঁটে বাঁশ শুধু দোল খায় নিশ্চিন্ত মনে। জীবনের ঝড়-ঝাপটা তাকে কাবু করে দিয়েছে, গণেশের মা ঠিক আছে তার

নিজের মতিগতি বজায় রেখে। নইলে এত সব ভয়ানক বিপর্যয় কাণ্ডের পর, ঘর-বাড়ী ছেড়ে পরের আশ্রয়ে এসে রাতারাতি সহরের উদ্দেশে অনির্দ্দিষ্ট যাত্রার প্রতীক্ষা করার সময়, তাকে কাঁথার নীচে ঢুকিয়ে একটু আরাম আর বিশ্রাম দেওয়াবার জন্য এত চালের কথা কইতে পারত গণেশের মা। সব ব্যাপারের মোটামুটি মানেটা বুঝেই গণেশের মা নিশ্চিন্ত। মেয়েকে তার জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ব্যারাকে, গাঁয়ের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে গিয়ে মেয়েকে তার উদ্ধার করে এনেছে, ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, রাতারাতি তাদের সরিয়ে এনে ফেলেছে এখানে সহরে গণেশের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য, এই পর্য্যন্ত জেনে গণেশের মা কাঁদাকাটা হা-হুতাশ বাতিল করেছে। কত যে আরও ফ্যাকড়া আছে এ ব্যাপারে, সেটা তার খেয়াল নেই। এ ব্যাপারের জের যে কোথায় গড়াবে, কেন যে তাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাতারাতি, কত হাঙ্গামা কত দুর্দ্দশা যে জমা হয়ে আছে তাদের জন্য সামনের দিনগুলিতে, যে সব কথা মাথায় আসে না ওর। সহরে গিয়ে ছেলের কাছে গিয়ে থাকবে ভেবেই সে খুশী, তার রোজগেরে ছেলে! মাসেমাসে টাকা পাঠাচ্ছে ছেলে, সে থাকতে ভাবনা কি তাদের?

এখনো জ্বলছে বাবা আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলছে। রাণী হঠাৎ বলে মুখ না ফিরিয়েই।

তুই তো একটু শুলে পারতিস রাণি? গণেশের মা বলে আবেগহীন গলায়। এই মেয়েই যে যত ঝনঝাট যত বিপাকের মূল এ কথা ভেবে তার কোন জ্বালা নেই। সংসারের আর দশটা ঝন্‌ঝাটে নয় মেয়ে বলে ওকে গঞ্জনা দেওয়া চলে, এই সৃষ্টিছাড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপারে ওকে দায়িক ভাবা কি যায়? গণেশের মার অন্য দুশ্চিন্তা। মেয়ে তার খাঁটিই আছে, কিন্তু লোকে কি তা জানবে না মানবে: কেউ কিছু না বলুক, সবাই দরদ দেখাক, তবু মেয়ে তার ধর্ম্ম নাশের ছাপ মারা হয়ে রইল সকলের কাছে। সুধীর হয় তো মেয়েকে তার নেবে না এই অজুহাতে। এ সব রাণী কি করে সইবে, অসহ্য হলে ঝোঁকের মাথায় কি করে বসবে, তাই ভাবে গণেশের মা। সেবার পদীর কচি মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল গাঁতরার ক্যাম্পে, সারারাত পদী মেয়ের কান্না শুনেছিল আর পাগলের মত পাক দিয়েছিল ক্যাম্পের চারিদিকে। সকালে আধমরা মেয়ে নিয়ে পদী গাঁয়ে ফিরলে কি হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল চারি-দিকে, কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল চারদিকের হিন্দু-মুসলমান চাষাভূষো সব একজোট হয়ে. বড় হাকিম নিজে এসে ব্যবস্থা করার কথা না দিলে কাণ্ডই হয়ে যেত একটা। কাণ্ড হল শেষ-তক, তার মেয়েকে নিয়ে। পদীর মেয়ের দিকে ছিল সবাই, প্রাণ দিয়ে মায়া করেছে তাকে সবাই, সে নিজেও কি একদিন

কেঁদে ফেলেনি তাকে বুকে জড়িয়ে দুটো কথা কইতে গিয়ে? তবু তো পুকুরে ডুবে মরল পদীর মেয়েটা। গাঁয়ে থাকতে হলে রাণীই বা কি করে বস্‌ত কে জানে। তার চেয়ে এ ভাল হয়েছে। ভাঙ্গা ঘর আর ভিটেটুকু বাঁধা পড়ে আছে, ঋণের বোঝা জমে আছে পাহাড় হয়ে। কি হবে এ ভিটের মায়া করে? তার চেয়ে সহরে অচেনা লোকের মধ্যে রাণীও বাঁচবে শান্ত মনে, তারাও থাকবে সুখে শান্তিতে।

গণেশের মার সুখশান্তির স্বপ্নও খোলা আর খোসা দিয়ে গড়া। তার বেশী চাইতে ভুলেও গেছে, সাহসও হয় না। না খেতে পেয়ে একেবারে না মরলে, রোগে বিপাকে মরণাপন্ন না হলে, মাথা গুঁজবার ঠাঁইএর অভাব না ঘটলে তার কত শান্তি কত সুখ লাভ হত!

কেশব একটি পুরাণো কম্বল হাতে করে ঘরে আসে, ঘরে তৈরী বালাপোষ গায়ে জড়িয়ে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে, শীর্ণ মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁপদাড়ি। সহজ শান্ত ভাব, একটু গাম্ভীর্যপূর্ণ। মাঝরাত্রে হঠাৎ এই খাপছাড়া অতিথি পরিবারটির আবির্ভাবে তাকে কিছুমাত্র ব্যস্ত বা বিপন্ন মনে হয় না।

খিচুড়িটা নামবে এবার, কম্বলটা যাদবের কাছে নামিয়ে রেখে সে ঘরোয়া স্বরে বলে, খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করেই রওনা দিতে হবে। নৌকোয় ঘুমানো চলবে। নৌকো খুঁজতে গেছে।

মোর তরে সবার বিপদ হল, পালাতে কেমন লাগছে বদ্যি মশায়।

কেশব মাথা নেড়ে যেন তার এই অনুভূতির সঙ্গতিতেই সায় দেয়, বলে, পালাচ্ছো না তো, পালাবে কেন। ওরা তো ছেড়ে কথা কইবে না, কদিন তাণ্ডব চলবে চাদ্দিকে। তোমাদের ওপর ঝাল বেশী, প্রথম ধাক্কাটা পড়বে তোমাদের ওপরে। তোমরা তাই কটা দিন নিরাপদ যাগায় গিয়ে থাকবে। অবস্থা ভাল হলে, দেশের লোক প্রতিবাদ স্নরু করলে অতটা যা তা করা চলবে না, যখন আইনসঙ্গত এনকোয়ারী স্নরু হবে, কেশবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দেয় ক্ষণিকের জন্য, তখন তোমরা ফিরে আসবে সাক্ষী দিতে। তোমার মেয়ে আমাদের তরফের বড় সাক্ষী।

সাক্ষী দিতে হবে? দেব। আমি সাক্ষী দেব। রাণী এতক্ষণে জানালা ছেড়ে সরে আসে।

কেশব নীরবে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

কাছাকাছি থাকতে পারি না কোথাও গা ঢাকা দিয়ে? যাদব শুধোয় সংশয়ের সঙ্গে।

ছেলের কাছে যাবে বলছিলে না? তাই ভাল। কলকাতাতেই যাও, কেশব বলে চিন্তিত ভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে, সাক্ষী দেয়ার দরকার হবে কি না শেষ পর্য্যন্ত তাই বা কে বলতে পারে। দুঁদে প্রজাগুলোকে জবদ করার এ সুযোগ

জগৎবাবু ছাড়বে না। ও আবার কি পরামর্শ দেয়, কি দাঁড় করায়। নাঃ, ছেলের কাছেই যাও তুমি।

কেশবের স্ত্রী মেনকা এসে বিনা ভূমিকায় বলে, এসো দিকি তোমরা খেয়ে নেবে দুটি। ডিবরিটা আনিস তো বাছা তুই, কি নাম যেন তোর মা, রাণী? ওমা, ডিবরি যে নিভলো বলে।

তেল তো নেই আর। কেশব বলে।

রসুই ঘরের ডিবরি থেকে দিচ্ছি একটু।

সবাইকে একসাথে বসিয়ে দেয় মেনকা, রাণী আর গণেশের মাকে পর্যন্ত। খিচুড়ি খেতে বসে যাদবের চোখে হঠাৎ জল আসার উপক্রম হয়। তার মত গরীব হাঘরে তুচ্ছ মানুষের জীবনেরও যে দাম আছে দশজনের কাছে, তার মত লোকের মেয়ের সম্মান যে নিজের মেয়ের সম্মানের মত হতে পারে দশজনের কাছে, এ জ্ঞান এ অভিজ্ঞতা তাকে প্রায় অভিভূত করে রেখেছে প্রথমাবধি। চিরকাল নিজেকে সে জেনে এসেছে একান্ত অসহায়, দুর্ভিক্ষে হাড়ে মাসে টের পেয়েছে সে বা তার পরিবারের বাঁচন মরণে কিছু এসে যায় না জগতের কারো। আজ সে জেনেছে তা সত্যি নয়। ডান হাতে চোট লেগেছে, মুখে খাবার তুলতে কষ্ট হয়। কিন্তু সে বেদনা যেন গায়ে লাগে না যাদবের, ব্যাণ্ডেজের নীচে মাথার ক্ষতটা যে দপ্ দপ্ করছে সে যন্ত্রণাও বাতিল হয়ে গেছে তার কাছে। ভিতরে একটা

ক্ষোভ আর আক্রোশকেই যেন জাগিয়ে বাড়িয়ে চলছে শরীরের আঘাতগুলির যন্ত্রণা। সে ফিরে আসবে, বৌ-ছেলে-মেয়েকে গণেশের কাছে রেখে সে ফিরে আসবে তার জন্য যারা লড়ছে তাদের সাথে যোগ দিতে।

ভাগচাষের বাটোয়ারা আর বেগার খাটা নিয়ে যে লড়াই বাড়ছিল দিন দিন, যে হাঙ্গামার সুযোগে সাঁজ সন্ধ্যায় মেয়েকে তার টেনে নিয়ে যাবার সাহস ওদের হয়েছে, তাতে ভাল করে যোগ দেয়নি বলে আপশোষ হয় যাদবের। তাকে যারা আপন ভাবে, তার জন্য বাঁচন মরণ তুচ্ছ করে, তাদের ব্যাপারে সে উদাসীন ছিল কেমন করে?

তাদের খাওয়া শেষ হবার আগেই নৌকার খোঁজে যে দু'জন গিয়েছিল তারা ফিরে আসে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে তাদের নিয়ে নৌকা ছেড়ে দেয়। কারো বারণ না শুনে রাণী ছইএর বাইরে বসে চেয়ে থাকে, আগুনের রক্তিম আভার দিকে। মধুখালি অতিক্রম করেই নৌকা যাবে।

মরেই যে গেছে, বিশেষ করে যাকে স্পষ্টই চেনা যায় কুলি বা চাকর বলে, তার জন্য হাসপাতালের লোক বেশী আর মাথা ঘামাতে চায় না। মরণের খবর জানবার প্রয়োজন যেন কিছু কম তার আপনজনের, প্রাণহীন শরীরটা যেন কিছু কম মূল্যবান তাদের কাছে। বাঁচাবার চেষ্টা সাঙ্গ হবার সঙ্গে অবশ্য প্রধান কর্ত্তব্য শেষ হয়ে যায় হাসপাতালে। জীবিতের দাবীই তখন বড়। ওসমান তা জানে। আচমকা বহুসংখ্যক আহত ও মরণাপন্নদের আবির্ভাবে সকলে খুব ব্যতিব্যস্তও বটে। তবু, চটমোড়া মালটা খুলে মৃত লোকটির নাম ঠিকানা জানবার কোন উপায় মেলে কিনা এটুকু চেষ্টা করে দেখবার অবসর কি কারো নেই? কোন একটা হদিস পেলে আজ রাত্রেই খোঁজ নিতে যাবার জন্য সে তো রাজী ছিল, যত রাস্তা হাঁটতে হয় হাঁটবে। কিন্তু কালকের জন্য ও কাজটা স্থগিত রাখা হয়েছে। মিছা-মিছি হাঙ্গামা করে লাভ নেই আজ। সকলে বড় ব্যস্ত।

গণেশের কুর্ত্তার পকেটে এক টুক্‌রো কাগজে পেন্সিল দিয়ে ইংরাজীতে লেখা একটা ঠিকানা পাওয়া গিয়েছিল। জেম্‌স ষ্ট্রীটের একজন এল, ক্যামারণের ঠিকানা। অনেক বলে বলে ওখানে ওসমান একটা টেলিফোন করাতে পেরেছিল। ক্যামারণ কিছুই জানে না। বর্ণিত মৃতদেহ তার কোন জানা লোকের নয়। না, কোন মালের সে অর্ডার দেয় নি, কোন মাল তার কাছে পেঁাছবার কথা ছিল না।

আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল একবার এসে খবর নিয়ে যাবে। এক আত্মীয়কে মৃত রেখে, অজানা রেখে যেতে হচ্ছে মনে হয় ওসমানের। হাস-পাতালে আসবার সময়ও ভেতরে ক্ষীণ একটু প্রাণ ছিল ছেলেটার, বাইরে যার কোন লক্ষণ ছিল না। খানিক পরেই জীবন শেষ হয়ে যায়, নিঃশব্দে, চুপি-চুপি। ওর আসল আশ্চর্য্য মরণ ঘটেছিল রাস্তায় তার কাছে, মাথায় গুলি লাগার পরেও দাঁড়িয়ে থেকে, কথা বলে, হঠাৎ দ্রুত গতিতে নির্জীব নিঝুম হয়ে ঢলে পড়ে। একটি কাতরানির শব্দ বার হয়নি মুখ দিয়ে। একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়নি মারাত্মক আঘাত লাগার, অসহিষ্ণু উদ্বেগেরে সঙ্গে শেষ প্রশ্ন উচ্চারণ করেছিল, ওরা এগোবে না? তখনো তো ওসমান জানত না জীবন ওর শেষ হয়ে এসেছে, এ জগতে আর কোন কথাই সে জিজ্ঞাসা করবে না কাউকে, এগোতে গিয়ে বাধা পেয়ে যারা থেমেছে তারা এগোবে কিনা জানতে চাইবে না। মাথায় গুলি লাগার জন্য হয় তো এ রকম হয়েছে, মস্তিষ্কের একটা অংশ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছোকরা ডাক্তারটি তার বর্ণনা শুনে যা বললেন, হয় তো তাই হবে, ওসমানের জানবার কৌতূহল নেই। তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এই মরণ। নিকট-আত্মীয়কে হয় তো সে ভুলে যাবে, অদ্‌ভুত মরণের স্মৃতির মধ্যে ছেলেটি চিরদিন বাস করবে তার মনে।

নিজের মরণের দিন পর্য্যন্ত সে ভুলতে পারবে না ছেলেটির ব্যাকুল প্রশ্ন : ওরা এগোবে না ?

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তার দেখা হয় রসুল আর শিবনাথের সঙ্গে। রসুলের ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ, রক্তক্ষরণের ফলে মুখ তার ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বসে বসে বোকার মত, গোঁয়ারের মত রক্ত নষ্ট করার জন্য শিবনাথ এখনো তাকে অনুযোগ দিচ্ছিল।

ওসমান ওদের চিনতে পারে দেখা মাত্র, কিন্তু নিজে যেচে কথা বলতে তার বাধ' বাধ' ঠেকে। ওরা তার ছেলের বন্ধু ছিল, হাবিবের বাপ বলে তাকেও চিনত, এই পর্য্যন্ত। ট্রামের কণ্ডাক্টর বলে চিনত। ছেলে আজ নেই, তারও কারখানার মজুরের পোষাক। কথা বলতে গেলে হয় তো দুটো এলোমেলো খাপ-ছাড়া কথাই হবে, অর্থহীন অস্বস্তিকর সে আলাপে কাজ কি। ওসমানের নিজের কিছু আসে যায় না তাতে, কিন্তু ওদের অস্বস্তি সৃষ্টি করে লাভ নেই।

শিবনাথ চিনতে পেরে প্রথমে বলে, আপনি এখানে?

রসুল ক্ষীণকণ্ঠে বলে, এখন হাসপাতালে কি করছেন সাব? আপনার কেউ কি—?

একটি ছেলের সঙ্গে এসেছিলাম। মাথায় গুলি লেগেছিল, মারা গেছে। ওসমান একটু ইতস্ততঃ করে যোগ দেয়, আমার কেউ নয়। পাশে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ—

বাড়ী যেতে মুস্কিল হবে।

পা আছে।

তা আছে বটে।

রসুলের হাতে কি হয়েছে সব যেন জানে ওসমান এমনি ভাবে জিগ্যেস করে, হাতটা বাঁচবে তো?

কি জানি। সন্দেহ আছে।

ইস্! ডান হাত।

কথা বলতে বলতে তিনজনে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। কত রোগ, আঘাত যাতনা মৃত্যু শোক দুঃখ হতাশা ভরা হাসপাতালের এলাকা, হৃদয় ভারি তিন জনেরই। তবু তারা সহজ ভাবেই কথা কয়, জীবন্ত মানুষের যেন জীবনের অকারণ অর্থহীন অভিশাপগুলির জন্য বিচলিত হতে নেই, ব্যাকুল হতে নেই, ব্যথাও পেতে নেই!

রসুল এক রকম কথাই বলছিল না, হঠাৎ থেমে গিয়ে সে শিবনাথকে বলে, সরমের কথা ভাই, কিন্তু আর পারছি না। অজ্ঞান হয়ে পড়ার আগেই—

ওসমান ও শিবনাথ দু'পাশ থেকে ধরে তাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে বসিয়ে দেয়, নিজে বসে ওসমান তার মাথাটা বুকে টেনে এনে নিজের গায়ে তাকে হেলান দেওয়ায়।

তুই এক নম্বর আহম্মক রসুল।—শিবনাথ বলে গায়ের ...ার গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে।

ওসমান বলে, এরকম আহম্মক কম মেলে। ভেবেছিল কারো হাঙ্গামা না বাড়িয়ে কোনমতে বাড়ী পৌঁছে যাবে। হাবিব বলত, নিজের অসুখ হলে রসুল লজ্জা পায়।

তাইতো ছোঁড়াকে সবাই এত ভালবাসে।

রসুল আপশোষ করে বলে, এত রক্ত বেরিয়ে গেছে টের পাইনি। তাহলে কি এক লহমা দেরী করি হাসপাতালে আসতে, নিজেই আসতাম।

রসুল হাসপাতালেই থেকে যায়। ওসমান ও শিবনাথ যখন রাস্তায় নামে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে, জনহীন স্তব্ধতায় রাত্রিকে যেন ধরা ছোঁয়া যেতে পারছে।

শিবনাথ চিরকাল বাইরে ধীর শান্ত ছেলে, সহজ ও সাধারণ। কখনো কোন বিষয়ে কেউ তাকে আত্মহারা হতে দ্যাখে নি, যা কিছু ঘটছে বর্ত্তমানে চোখের পলকে তার ভবিষ্যৎ অনুমান করে নিয়ে সে যেন তদনুসারেই যা করা উচিত তাই করে যায়---সব রকম সহজ বা কঠিন সামান্য বা গুরুতর কাজ। কোন কাজেই তার পরোয়া নেই, সভায় বক্তৃতা করা থেকে চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসার কাজ পর্য্যন্ত---আহত রসুলকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার কাজও। যে কাজ দেওয়া হোক সে করবে প্রাণ দিয়ে, কিন্তু এক রকমের এক ধরণের কাজে তার মন ওঠে না। ওখানে ওই গুরুতর পরিস্থিতিতে সে অনায়াসে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছে, তারপর আর দরকার না থাকায় কাজ পালটে দায়িত্ব

নিয়েছে রসুলকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার। ফিরে গিয়ে হয় তো চা এনে দেবার ব্যবস্থা করবে শীতে যারা রাস্তা কামড়ে বসে আছে খোলা আকাশের নীচে তাদের জন্য।

না, চায়ের ব্যবস্থা করবে না, ওসমান ভাবে লজ্জিত হয়ে। ওরকম উদ্ভট কাজ শিবনাথ করে না। সহজ স্বাভাবিক কাজই সে করে। ফিরে গিয়ে সে কি করবে ওসমান জানে না।

শিবনাথের কথা সে শুনেছে রসুলের কাছে। সব যায়গায় সব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেবার ওর নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা, কেবল বাইরে নয়, বাড়ীতে পর্য্যন্ত। বাইরের এসব কাজ ওর বাপদাদা পছন্দ করে না, কিন্তু সংসারে সব বিষয়ে ওর পরামর্শ নিয়েই নাকি চলে তারা, বিয়ের ব্যাপার থেকে অসুখ .বসুখে চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারে পর্য্যন্ত।

শিবনাথের কথা শুনে ওসমানের মনে হয়, ঠিক কথা, ছেলেটা ওই রকমি সন্দেহ নেই। ঘটন অঘটনে ভরপুর গভীর রাত, স্তব্ধ বিষণ্ণ পথে চুপ চাপ পথ চলাই ছিল খাপসুরৎ। ছেঁড়া কিছু জড়িয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পুঁটলীর মত ফুটপাতে শুয়ে আছে মানুষ, মাংসের বন্ধ দোকানটার সামনে তেমনি কুণ্ডলী পাকিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে ঘেয়ো কুকুর। কোন কি দরকার ছিল শিবনাথের কথা বলার। কিন্তু কথা যখন সে বলল, ওসমানের মনে হল, এরকম কথা না বলে মুখ বুজে তার সঙ্গে পথ চললে ভারি অন্যায় হত শিবনাথের।

রসুলের মত ছেলে পাওয়া ভার। ডান হাতটা গেল, আপশোষ নেই। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে সুরু করেছে ডান হাতটা গেলেও বাঁ হাত দিয়ে কি করে সব কাজ চালিয়ে নেওয়া চলবে। রসুল আমার ভায়ের মত।

কি লাগসই কথাটাই বলল শিবনাথ তার মনের কথার সঙ্গে মানিয়ে এই রকম কথা বলার জন্যই যে উন্মুখ হয়ে ছিল ওসমান, তাকি জেনেছে শিবনাথ?

ওসমান বলে, রসুল আমার ছেলের মত।

ওসমানের কথার গতি ধরতে না পেরে শিবনাথ চুপ করে থাকে।

ওসমান বলে, সাচচা ছেলে, তবে দোষ ছিল একটা। ভাবত কি, রাজা বাদসা খানসা'বরা গরীবের দুঃখ ঘোচাবে, বাবুরা বেহেস্ত বানিয়ে দেবে ওদের জন্য। রোজ বাধত হাবিবের সাথে, ঘরে থাকলে আমি শুনতাম চুপচাপ। একদিন হাবিবকে বলেছিলাম, যে শুনবে না বুঝবে না তার সাথে অত কথায় কাজ কি? হাবিব বলেছিল, ভেতরটা সাচচা আছে, ও ঠিক বুঝবে একদিন, এসব ছেলে যদি না বোঝে না বদলায় তবে কে বুঝবে, কে বদলাবে?

নীরবে কয়েক কদম হাঁটে ওসমান, রসুল বদলে গেছে। হাবিবের কাজ এটা। হাবিব থাকলে খুসী হত। ওর মধ্যে হাবিব বেঁচে আছে মালুম হল। ছেলের মত মনে হল ওকে।

সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় এতটুকু আনমনা মনে হয় না অনুরূপাকে, তার কোমল ভীরু হাসিটি বার বার দেখা দেয় মুখে, কিন্তু ক্ষীণ একটা অস্বস্তি তিনি অনুভব করেন। এখনো ফিরল না কেন হেমন্ত? দুটো বাজল বড় ঘড়িটায়। কলেজ থেকে সে সোজা বাড়ী চলে আসে, কোন কারণে ফিরতে দেরী হবার সম্ভাবনা থাকলে যাবার সময়েই বলে যায়, নয়তো বাড়ী ফিরে এসে আবার বার হয়। আজ তো কলেজও নাকি হয় নি। সরকারী কলেজ হেমন্তের, সেখানে ক্লাশ যদি বা হয়েই থাকে পূরোপূরি, অনেক আগেই হেমন্তের ফিরে আসা উচিত ছিল আজ।

আধঘণ্টার মধ্যে তাকে বেরিয়ে যেতে হবে গান শেখাতে। তার আগে কি ফিরবে না হেমন্ত?

দোকান থেকে চা আনিয়ে দেন অভ্যাগতাদের, অপরাধীর মত বলেন, দোকানের চাই খেতে হবে, ঘরে চিনি নেই।

তাতে কি হয়েছে।

সবারি এক অবস্থা, বাড়ীতে কেউ এলে আমিও দোকান থেকে চা আনিয়ে দি, কি করব, নিজেদেরি কুলোয় না।

আমি কিন্তু বাড়তি চিনি পাই। একটাকা সের নেয়, কিন্তু কি করব তাই কিনি, চিনি নইলে তো চলে না। একটা দোকান আছে, তেল আর চিনি দুই-ই পাওয়া যায়। সকলকে দেয় না, দোকানীরও তো ভয় আছে। জানা লোক গেলে দেয়।

আমিও পাই চিনি, মাসের গোড়ায় দু'-তিন বার আধসের করে এনে জমিয়ে রাখি, একবারে বেশী দেয় না। একটাকা সের পান আপনি? আমার কাছে পাঁচসিকে নেয়।

ওরকম তো পাওয়াই যায়, অনুরূপা বলেন, আমি আনাই না। কেমন খারাপ লাগে। ব্ল্যাকমার্কেটকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তো ওতে। তাছাড়া বড় ছেলে যদি টের পায়—

অনুরূপা ভাবে, দ্যাখো, ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে কি খাপছাড়া কথা বলে ফেললেন। দুটি মুখ ভার হয়ে গেল তার কথায়। খোঁচা দিয়ে ফেলার জন্য মৃদু আপশোষের সঙ্গে আরেকটা খুসীর চিন্তাও মনে আসে অনুরূপার। বলেই যখন ফেলেছেন তখন আর উপায় কি, হেমন্ত শুনে মজা পাবে, খুসী হবে। হেমন্ত খেতে বসলে বেশ করে সাজিয়ে বলতে হবে গল্পটা তাকে।

কবে যে অবস্থা একটু ভাল হবে।

সত্যি, যুদ্ধ থামল কবে, ভাবলাম যাক, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। অবস্থার উন্নতি হল ছাই, দিন দিন আরও যেন খারাপ হচ্ছে। দ্যাওরের চাকরিটা যাবে সামনের মাসে। আবার এসে ঘাড়ে চাপবে সবাইকে নিয়ে। তিন বছর ছিল না, অন্য সময় হলে কিছু পয়সা জমত হাতে, যুদ্ধের বাজারে তাও পারলাম না। উনি গুঁইগাঁই করছিলেন, আমি স্পষ্ট কথা

লিখিয়ে দিয়েছি, যে দিনকাল, আমরা আর পারব না। পারা কি যায়, আপনারাই বলুন?

আমার তো মেজ সেজ দুটি ছেলেই নোটিশ পেয়েছে। মাথা ঘুরে গেছে ভাই। বড় জন তো একরকম ভিন্নই, দিল্লীতে থাকে, দশখানা চিঠি দিলে একখানারও জবাব দেয় কি দেয় না।

ভয় ও হতাশা উদ্যত হয়েই ছিল দাঁড়ানো কুয়াসার মত, অতি মন্দ বাতাসের মত অতি মৃদু এই আলোচনাকে আশ্রয় করে গড়িয়ে আসে ঘরে। অনুরূপা ঢোঁক গেলেন। গলাটা শুকনো মনে হয়, খুস খুস করে। গলায় যাদ কিছু হয় তার, গাইবার ক্ষমতা যদি নষ্ট হয়ে যায় কোন কারণে—হেমন্ত লেখা পড়া শিখে মানুষ হয়ে উঠবার আগে! কত গায়ক গায়িকার অমন গিয়েছে। গান শেখানোও ঝকমারির কাজ। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এমন অত্যাচার চলে গলার ওপর। গান শেখানোর কাজ ছেড়ে দেবেন একটা দুটো বাড়ীর? কিন্তু তাহলে কি চলবে তাঁর সংসার, হেমন্তের পড়ার খরচ?

গান শোনাবেন একখানা?

গান? অনুরূপা তাঁর ক্ষীণ কোমল হাসি হাসেন, গান গেয়ে শোনাবার গলা কি আর আছে? গান শিখিয়ে শিখিয়েই গলা গেছে। গাইতে পারি না আর।

একটু ক্ষুণ্ন হয়ে তারা বিদায় নেয়। অনুরূপা জানেন ওদের মনের **ভাব:** একটু গাইতে জানলে, একটু নাম হলে,

এমনি অহঙ্কারই হয় মানুষের। গলাকে বাড়তি এতটুকু পরিশ্রম করাতে তাঁর যে কত কষ্ট, কত ভয়, ওরা তার কি বুঝবে।

জয়ন্ত বলে, এবার যাব মা খেলতে?

এতক্ষণ যাওনি কেন?

জিজ্ঞাসা করা বৃথা, অনুরূপা জানেন। বাড়ীতে লোক এলে এ ছেলে ঘর ছেড়ে নড়তে চায় না, বসে বসে বুড়ীদের আলাপ শুনতে পর্য্যন্ত কি যে ভাল লাগে তের বছরের ছেলের।

যাও। দূরে যেও না কিন্তু। শীগ্‌গীর ফিরবে।

রমাও বাড়ী নেই, শান্তাদের ওখানে গেছে। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে নতুন গানটি সেধে রাখবে বলেছে। অন্যের মেয়েকে নটা পর্য্যন্ত গান শিখিয়ে বাড়ী ফিরে তখন অনুরূপা নিজের মেয়ের গান কেমন তৈরী হল শুনতে পাবেন। তবে, গানের পেছনে বেশী সময় রমার না দিলেও চলে। মোটামুটি ও যা শিখবে তাই যথেষ্ট। ওকে খুব ভাল করে শেখালেও গানে ও বিশেষ কিছু করে উঠতে পারবে না, গানের ধাত নয় ও মেয়ের। অনুরূপা একটা নিশ্বাস ফেলেন। খালি বাড়ীতে নিজেকে কেমন শ্রান্ত, অবসন্ন মনে হয়। সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে কিন্তু গভীর আলস্যে উঠতে ইচ্ছা করছে না আজ। হেমন্ত ফিরে এলে হয় তো আলস্যটা কেটে যেত, জোর মিলত উঠে গিয়ে ছড়া বলার গলা বা সুরজ্ঞান পর্য্যন্ত নেই যে মেয়ের, নিজের গলার আওয়াজ

শুনেই ভাব লেগে যে মেয়ের খেয়াল থাকে না সুর কোথা গেল, তাদের গান শিখিয়ে আসতে।

এই রকম সময়ে, ছেলে বা মেয়ে যখন কাছে থাকে না কেউ, কেমন আর কিসের অজানা সব শঙ্কার ছায়াপাতে হৃদয় মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে অনুরূপার। নিরাপত্তার জন্য নিজেকে একরকম ছেঁটে ফেলেছেন, সহজ ও সীমাবদ্ধ করে এনেছেন জীবন ও জীবনের পরিধি, যেমন চেয়েছেন তেমনি দিন চলছে শান্তিতে, ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে উঠছে মনের মত। কোথা থেকে তবে এত সংকেত আসে বিপর্যয়ের, বিভ্রাটের, বিপদের? কেন কেঁপে কেঁপে ওঠে অনুরূপার ভীরু বুক? পৃথিবী জোড়া যুদ্ধ তাকে বিচলিত করেনি। সে যুদ্ধের যত ধাককা এসে লাগুক তার ঘরে, সে অসুবিধা, শুধু টানাটানি, কষ্ট করার ব্যাপার---বোমার ভয়ের দিনগুলিও তাকে এমন সচকিত করে তুলতে পারেনি। মনে হয়েছে ওসব দূরের বিপদ---বহু দূরের। তাদের চারটি প্রাণীর ছোট নীড়টিতে ও বিপদের ছোঁয়াচ লাগবে না। কিন্তু এ বিপদ যেন বাতাসের গুমোটের মত, মাথার উপরের আকাশে ঘন কালোমেঘের মত ঘনিয়ে আসছে অনুভব করা যায়। খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে মনে হয়, সব খবরের আড়ালে যেন দুরন্ত ক্ষোভ গুমড়াচ্ছে মানুষের, পথে ঘাটে লোকের কথা শুনলে মনে হয় সব চিন্তা একদিকে গতি পেয়েছে মানুষের, চারিদিকে সভা আর শোভাযাত্রায় সেই চিন্তা ফেটে পড়ছে

হাজার কণ্ঠের গর্জনে। প্রতি মুহূর্তে ঘরে বাইরে চেতনায় যা ঘা দিচ্ছে, জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুর সঙ্গে যা জড়িয়ে গেছে, তা কি ঠেকিয়ে রাখা যাবে ঘরের নিরাপদ সুখশান্তি অব্যাহত রাখতে চেয়ে?

রমা ফিরে আসে প্রচুর উত্তেজনা নিয়ে।

বেরোও নি তো? বেশ করেছ। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। জানো মা, ট্রাম চলছে না। ওদিকে খুব হাঙ্গামা চলছে, পুলিশ নাকি গুলি চালিয়েছে—কি ভাবছো মা?

কিছু না। হেমা ফেরেনি এখনো।

ও! দাদার জন্য ভাবছো? রমা হাল্কা সুরে বলে, দাদা কস্মিনকালে ওসবের মধ্যে যায় না, যাবেও না। কোথায় গেছে, এখুনি এসে পড়বে। দাদার জন্য ভেবো না।

রমার কথা আর কথার সুর আঁচড় কাটে অনুরূপার কাণের পর্দায়। রমার গলায় তার দাদার সম্বন্ধে অবজ্ঞার সুর শোনা যাবে, এই বিপদের আশঙ্কাও বুঝি তার ছিল!

না, ভাবনার কি আছে! গানটা ভাল করে শিখবি রমা? কাপড় ছেড়ে আয়।

রমাকে বিপন্ন দেখায়। তার মুখে দারুণ অনিচ্ছা।

আজ থাক গে। গানটান শিখতে আজ ইচ্ছে করছে না মা।

তবে থাক।

জয়ন্ত ফিরে আসে আরও বেশী উত্তেজনা নিয়ে। যত কিছু সে শুনে এসেছে বাইরে থেকে সব অনুরূপাকে শোনায়। তারপর এক মারাত্মক প্রস্তাব করে।

একটু দেখে আসব মা? একটুখানি? দূর থেকে একটু দেখেই চলে আসব। যাব?

না।

কি হয় গেলে? এসে পড়তে বসব।

আজ পড়তে হবে না। আজ তোর ছুটি। মুখহাত ধুয়ে আয়, গল্প বলব একটা।

বানানো গল্প ভালো লাগে না মা।

বানানো গল্প ভাল লাগে না! এতটুকু ছেলে তার আজ সে রকম গল্প চাই, যা ধরাছোঁয়া দেখাশোনা যায়।

রাত বাড়ে, হেমন্ত আসে না। অনুরূপা উ[illegible] হয়ে থাকেন সদরের কড়া নাড়ার শব্দের জন্য। অস্বস্তি তা[illegible] উদ্বেগে দাঁড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রমার মনেও ভাবনা ঢুকেছে।

জয়ন্ত ঘুমিয়ে পড়লে অনুরূপা বলেন, আমি একটু খোঁজ করে আসি রমা।

কোথায় খোঁজ করবে এত রাত্রে?

সীতার কাছে যাই একবার। ওদের বাড়ী টেলিফোনও আছে।

সীতা সবে বাড়ী ফিরেছিল। হেমন্তকে বিদায় দিয়ে নেয়ে খেয়ে নিয়ে সেও বেরিয়ে গিয়েছিল। মনটা নাড়া খেলেও খাওয়ায় অরুচি জন্মানোর সখ তার নেই। তার বেশ খিদে পায় এবং সে খায়। তারপর আর কিছু খাওয়ার অবসর পায়নি এ পর্যন্ত। খাওয়ার ইচ্ছাটা মরে গেছে আজকের মত। চেনা অচেনা প্রিয়জনের আঘাত ও মরণ নাড়া দিয়েছে মনটাকে, সে তো আর ব্যক্তিগত দুঃখের কাব্য নয়। ক্ষোভ ছাড়া কোন অনুভূতিই তার নেই, যার আগুনে আরও শক্ত ও দৃঢ় হয়ে গেছে তার মন ও প্রতিজ্ঞা।

হেমন্ত? বাড়ী ফেরেনি?

সভায় একবার চোখে পড়েছিল হেমন্তকে। সেখানে তার উপস্থিতিকে বিশেষ মল্য সে দিতে পারেনি। তার সঙ্গে তর্ক করার উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই হয় তো সে সভায় এসে দাঁড়িয়েছে মনে হয়েছিল সীতার। তারপর হেমন্তের কথা আর তার মনে পড়েনি। আর অবসর হয় নি তার কথা মনে পড়ার, ভালও লাগেনি তার কথা ভাবতে। হেমন্তের সম্বন্ধে আশা-ভরসা কিছু আর রাখা চলে না এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া তার পক্ষে কষ্টকর। অন্য দিন জীবনের সাধারণ কাজ ও ঘটনার মধ্যে ভুলতে পারত না, দুঃখ ও ক্ষোভটা নেড়ে-চেড়ে খাপ খাইয়ে নিতে হত সচেতন প্রচেষ্টায়, আজ নিজের সুখ-দুঃখের কথা মনের

কোণায় উঁকি দেবারও অবসর পায়নি। দুঃখবেদনা হতাশার ওই স্তরটাই যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে, দূরে সরে গেছে।

অনুরূপার জন্য সে মমতা বোধ করে না। তার মনে হয়, মাতৃস্নেহের এই বিকৃত অভিব্যক্তির সঙ্গে সহানুভূতি দেখালে অন্যায় করা হবে। অনুরূপার মুখে উদ্বেগের ছাপটা স্পষ্ট দেখতে না পেয়ে সে একটু আশ্চর্য্য হয়। কিন্তু অতবড় ছেলে সন্ধ্যা রাতে বাড়ী ফেরেনি বলে পাগল হয়ে খোঁজ করতে বার হবার মধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে যথেষ্ট, মুখের ভাব যতই শান্ত থাক। গুলির মুখে ছেলে পাঠিয়ে কত মা বুক বেঁধে প্রতীক্ষা করছে ধৈর্য্য ধরে, ছেলের বেড়িয়ে ফিরতে দেরী হলে এঁর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। এর জন্যই হয়তো এত বেশী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে হেমন্ত, অতি আহলাদী ছেলেরা যা হয়।

কোথায় গেছে, আসবে। সীতা উদাস ভাবে বলে।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?

ও-বেলা একবার এসেছিল বারটা-একটার সময়।

তার কাছে অনুরূপা খোঁজ নিতে এসেছেন হারানো ছেলের। পৃথিবীতে এত লোক থাকতে তার কাছে। কথাটা এতক্ষণে খেয়াল হয় সীতার। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যভরা আগামী দিনের জীবনের পরিকল্পনায় তাকেও তবে ওরা মায়ে-ব্যাটায় হিসাবের মধ্যে ধরে রেখেছে? এমন হাসি পায় সীতার কথাটা মনে করে।

অনুরূপা জানেন, মনে মনে অন্ততঃ এই ধারণা পোষণ করেন, যে সীতা দু'দিন পরে তার ছেলের বৌ হয়ে তার বাড়ী যাবে। ছেলের ভাব দেখে তিনি অনুমান করে নিতে পেরেছেন এই মেয়েটিকে তার পছন্দ হয়েছে, তাই থেকে একেবারে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিলম্ব হয়নি। তার এত ভাল ছেলে, এমন উজ্জ্বল তার ভবিষ্যৎ, সীতার পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নটা মনের মধ্যে ঠাঁইও পায়নি তার।

এবার সীতা বুঝতে পারে অনুরূপার মুখে উদ্বেগের, দুর্ভাবনার চিহ্ন জোরালো হয়ে ফোটেনি কেন। ভাবী বৌয়ের সঙ্গে তিনি ভাবী শাশুড়ীর মত আচরণ করেছেন। ভয়ে-ভাবনায় সীতা কাতর হয়ে পড়বে, তাকে ভড়কে দেওয়া তার উচিত নয়। সীতাকে ভরসা দেবার, তার মনে সাহস জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব তারই!

সীতার নির্লিপ্ত ভাব তাই তাকে রীতিমত ক্ষুণ্ন করেছে, আঘাতও করেছে।

গম্ভীরমুখে রীতিমত অনুযোগের সুরে অনুরূপা বলেন—

না জানিয়ে কোন দিন বাড়ী ফিরতে দেরী করে না সীতা। বুঝে উঠতে পারছি না কি হ'ল।

সীতার হাসি পাচ্ছিল কিন্তু হাসির রেখাও তার মুখে ফুটল না। সে নিজেও জানত না মনের এ ভাবটা এত ক্ষণস্থায়ী হবে। ক্ষণিকের একটু আমোদ বোধ করে মনটা তার খারাপ

হয়ে যায়, নাড়া খায় গভীর ভাবে। হেমন্তের অনেক অন্ধতা, অনেক কুসংস্কার, অনেক দুর্বলতার মানে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। হেমন্তের দোষ নেই। এমন যার মা, আঁতুর থেকে আজ এত বয়স পর্য্যন্ত যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত এই মা নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে, তার হৃদয়-মনের গঠনের ত্রুটির জন্য সে নিজে কতটুকু দায়ী। এটুকু সীতা জানে যে শৈশবে মনের যে গঠন হয় জীবনে তার আর পরিবর্ত্তন হয় না। সজ্ঞান সাধনায় পরবর্ত্তী জীবনে চিন্তা ও অনুভূতির জগতে নূতন ধারা আনা যায় আপোষহীন অবিশ্রাম কঠোর সংগ্রামের দ্বারা। নিজের সঙ্গে লড়াই করার মত কষ্টকর, কঠিন ব্যাপার আর কি আছে জীবনে। বুদ্ধি দিয়ে যদি বা আদর্শ বেছে নেওয়া গেল, কর্ত্তব্য ঠিক করা গেল, সে আদর্শ অনুসরণ করা, সে কর্ত্তব্য পালন করা যেন ঝকমারি হয়ে দাঁড়ায় যদি তা বিরুদ্ধে যায় প্রকৃতির। ইণ্টেলেক-চুয়ালিজমের ব্যর্থতার কারণও তাই। বুদ্ধির আবিষ্কার, বুদ্ধির সিদ্ধান্ত কাজে লাগানোর চেয়ে অন্ধ অকেজো ভাল-লাগা ও পছন্দকে মেনে চলা অনেক সহজ, অনেক মনোরম। বুদ্ধি-জীবীদের মধ্যে তাই অধঃপতন এত বেশী। এত বেশী হতাশা। কথার এত মার-প্যাঁচ। এত ফাঁকিবাজী। বিশ্বাসের এমন নিদারুণ অভাব।

সীতা বলে, মাসীমা, ছেলে আপনার কচি খোকা নেই।

আমার কথাটা তুমি বুঝলে না সীতা। আমার ভয় হচ্ছে, ও তো হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েনি? কিছু হয়নি তো ওর?

সীতা এবার না হেসে পারে না, যদিও সে হাসিতে দুঃখ ও জ্বালাই প্রকাশ পায় বেশী: হেমন্ত কোন হাঙ্গামার ধারে কাছে যাবে!

এটা তুমি কি কথা বললে? অনুরূপা বলেন আহত মাতৃ-গর্বের অভিমানে, ছ'মাস এক বছর আগে বললে নয় কোন মানে হত। হেমা যে কি ভাবে বদলে যাচ্ছে তুমিও তা লক্ষ্য করনি বলতে চাও মা? আমার তো বিশ্বাস হয় না ও-কথা। ওর মধ্যে অদ্ভুত একটা অস্থিরতা এসেছে কিছু দিন থেকে। আমি জানি সেটা কিসের অস্থিরতা, ওর কি হয়েছে। তুমিও দায়ী এর জন্য।

আমি?

তুমি। তুমি দায়ী। তুমি কি বলতে চাও, তুমি টেরও পাওনি হেমা কি ভাবে ছটফট করছে, বদলে যাচ্ছে?

অনুরূপার অনুযোগে সত্যই খটকা লাগে সীতার মনে, মনে পড়ে আজ সে হেমন্তকে সভায় দেখেছিল। হয়তো নিছক খেয়ালের বশে সভায় যায়নি হেমন্ত। হয়তো নতুন চেতনা, নতুন অনুভূতির তাগিদেই সভায় যেতে হয়েছিল তাকে, নবজাগ্রত প্রশ্ন ও সংশয়গুলির নির্ভুল বাস্তব জবাব খুঁজে পাবার কামনায়। আত্মপ্রীতির জেলখানার প্রাচীরে হয়তো সত্যই

চিড় খেয়েছে হেমন্তের। দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে থেকেই সে যে চলে গিয়েছিল সভা ছেড়ে বিরক্ত হয়ে তাও তো জানা নেই সীতার। শেষ পর্য্যন্ত চলে হয়তো যেতে পারেনি, শোভাযাত্রায়ও হয়তো যোগ দিয়েছিল। প্রাণ তুচ্ছ করা অভিযানে সে যে অংশ গ্রহণ করেনি তাই বা কে জানে।

ভাবতেও এমন অদ্ভুত লাগে সীতার। নিজের মত সমর্থনের জন্য আজই হেমন্ত আরও বেশী রকম ভোঁতা, বেশী রকম সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেটা তবে তার কাছে নিজের দুর্ব্বলতা আড়াল করবার চেষ্টা। ভেতরে লড়াই চলছে বলে, পুরানো বিশ্বাস ভেঙ্গে পড়ছে বলে, বাইরে এমন অন্ধ এক-গুঁয়েমির সঙ্গে হার মানার অপমান এড়িয়ে চলতে হবে। তার কাছে কি কোন দিন নিজের ভুল স্বীকার করবে হেমন্ত? পারবে স্বীকার করতে? নিজের জন্য জয়ের লোভ নেই সীতার। তার কাছে শেষ পর্য্যন্ত হেমন্ত হার মানল এ সুখ সে চায় না। ভুল বুঝতে পেরে সেটা মেনে নেবার সাহস তার আছে, নতুন সত্যকে চিনতে পারলে সেটাকে গ্রহণ করার ছেলেমানুষী লজ্জা তার নেই, এটুকু জানলেই সে খুসী হবে।

অনুরূপাকে বসিয়ে সীতা নিজেই কয়েক যায়গায় টেলিফোন করে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর হাসপাতালে সাড়া পায় শিবনাথের। শিবনাথ আহতদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করছিল।

কার কথা বলছ? হেমন্ত? শিবনাথ বলে, হ্যাঁ হেমন্ত এখানে আছে।

সীতা মনে মনে বলে, সর্ব্বনাশ!

ওর খবর কি?

সামান্য লেগেছে, বিশেষ কিছু নয়। ড্রেস করে দিলেই বাড়ী যেতে পারবে।

হেমন্ত শোভাযাত্রায় ছিল?

ছিল।

গুলি চলবার সময় ছিল?

আগাগোড়া ছিল।

আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগছে।

কেন? আশ্চর্য্য হবার কি আছে? ওর রক্ত কি গরম নয়?

তর্ক দিয়ে ছাড়া রক্ত গরম করার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিল। ওকে বলবে, তাড়াতাড়ি যেন বাড়ী চলে যায়। ওর মা খুব উতলা হয়ে আছেন।

অনুরূপা প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, না না, ওকথা বলতে বোলো না সীতা। বারণ করে দাও। আমার কথা কিছু বলতে হবে না।

শিবনাথ, ছেড়ে দাওনি তো? শোন, হেমন্তকে ওর মার কথা কিছু বোলো না। শুধু বোলো আমি টেলিফোন করেছিলাম, তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে বলেছি।

হেমন্ত জানুক, সীতা সব জেনেছে, বুঝতে পেরেছে। ওবেলার তর্কটা তাদের বাতিল হয়ে গেছে একেবারে।

অনুরূপা মোহগ্রস্তার মত বসে থাকেন। ছেলে নিরাপদ আছে জানার পর এতক্ষণে তাঁর মুখ থেকে রক্ত সরে যাবার কারণ খানিকটা অনুমান করতে পারে সীতা। দ্বিধা-সংশয়ের দিন পার হয়ে গেছে হেমন্তের। সব রকম হাঙ্গামা থেকে নিজেকে সযত্নে বাঁচিয়ে বেঁচে থাকার স্বার্থদুষ্ট হীনতাকে আর সে প্রশ্রয় দিতে পারবে না। সে শুধু মনে মনে এটা করেনি স্থির, একেবারে হাতে নাতে বিদ্রোহ করেছে। সুখের রঙীন স্বপ্ন মুছে যাবার সম্ভাবনায় মুখের চেহারাও তাই বিবর্ণ হয়ে গেছে অনুরূপার।

আপনি অত ভাবছেন কেন মাসীমা ?

ভাবব না ? তোমার নয় খুসীর সীমা নেই, হেমন্ত এবার থেকে লেখাপড়া চুলোয় দিয়ে মিটিং করে বেড়াবে, জেলে যাবে, দেশোদ্ধার করবে। আমার অবস্থাটা বুঝে দেখেছ একবার ? আমার কত আশা-ভরসা হেমন্তের ওপর। তুমি যে আমার কি ক্ষতি করলে শুধু ভগবান জানেন।

---আমায় শেষে দায়ী করলেন মাসীমা ? সীতা বলে আশ্চর্য্য ও আহত হয়ে, ছেলেমানুষী ভুল করলেন একটা। আমার সঙ্গে মেশার জন্য আপনার ছেলে বদলায়নি। অত-বড় গৌরব দাবী করবার অধিকার আমার নেই। হেমন্ত নিজেই

বদলেছে, স্বাভাবিক নিয়মে। দেশের এই অবস্থা, এটা বুঝতে পারেন না যে সব কিছুর মধ্যে এদেশে রাজনীতি জড়িয়ে আছে, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে হলে তাকে তালা বন্ধ করে রাখা দরকার? শত শত আঘাত এসে ওকে সচেতন করে তুলবে, সামলাবেন কি করে? স্বাধীনতার প্রেরণাই ওকে জাগিয়েছে, দেশ-প্রেমের আলোই ওকে পথ দেখিয়েছে। আপনার কথা সত্যি, আমি পেরে থাকলে আমিই নিজেকে কৃতার্থ ভাবতাম মাসীমা। কিন্তু তা হয়নি। আমি তো তুচ্ছ, নেতাও কি মানুষকে জাগাতে পারেন? মানুষের মধ্যেই জাগরণ আসে, নেতা শুধু তার প্রতিনিধিত্ব করেন।

সীতা একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, আপনার আপশোষের কারণটাও মাথায় ঢুকছে না আমার। দেশের জন্য দশের জন্য ছেলে দুঃখ পেলে মার কষ্ট হয়, কিন্তু গৌরবও কি হয় না?

তুমি বুঝবে না সীতা, অনুরূপা জ্বালার সঙ্গে বলেন, আমার মত কষ্ট করে ছেলেকে যদি পড়িয়ে মানুষ করতে হত, তবে বুঝতে লেখাপড়ার ক্ষতি করে ছেলে ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে বসলে কেমন লাগে।

আপনি হেমন্তের ওপর অবিচার করছেন মাসীমা। ভুল করছেন।

কেন?

হেমন্ত লেখাপড়ার ক্ষতি করবেই, ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেই, এটা আপনি ধরে নিলেন কেন? লেখাপড়ায় ভাল করা ওর কর্ত্তব্য, তাতেই যদি অবহেলা করে, তবে তো ধরে নিতে হবে ওর অধঃপতন হল। দেশের কথা ভাবলে কি লেখাপড়া বাদ দিতে হয় মাসীমা? কোথাও কিছু নেই, জেলেই বা হেমন্ত যাবে কেন সখ করে? জেলে গেলেই কি কাজ হয় দেশের, দরকার থাক বা না থাক? হেমন্তেরও ঠিক এই রকম ধারণা ছিল, পড়লে শুধু পড়তেই হবে চোখকান বুজে, আর নয় তো সব ছেড়ে দিয়ে নামতে হবে রাজনীতিতে। মুক্তি-সংগ্রামে ছাত্রদেরও যে একটা অংশ আছে, সাধারণ অবস্থায় সে অংশ গ্রহণ করা যে পড়াশোনার এতটুকু বিরুদ্ধে যায় না, বরং চরিত্র গঠনে আর মানসিক শক্তির বিকাশে সাহায্যই করে, এই সহজ কথাটা মাথায় আসে না কেন আপনাদের মাসীমা?

তোমাদের মত মাথা নেই বলে বোধ হয়।

মন শান্ত হলে আপনার রাগ কমে যাবে।

আমি না লড়েই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব ভেবেছ বুঝি?

অনুরূপার কথার উগ্রতায় সীতা একটু আশ্চর্য্য হয়ে যায়, গভীর তীব্র বিদ্বেষে মুখখানা বিকৃত হয়ে গেছে অনুরূপার। নিরুপায়ের অন্ধ আক্রোশে তিনি যেন কাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছেন। হেমন্তকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য, তাকে সুমতি দেবার জন্য তিনি কি লড়াই করবেন?

ছেলেকে ভাল ছেলে করে রাখতে এতদিন যে লড়াই করে এসেছেন, তার চেয়েও জোরালো লড়াই? কিন্তু সে কথাটা বলতে গিয়েও এত বিদ্বেষ, এত আক্রোশ ফুটে উঠবে কেন তার কথায়, মুখের ভঙ্গিতে?

সংশয়ের সঙ্গে সীতা জিজ্ঞেস করে, আপনার কথা বুঝতে পারলাম না মাসীমা। কিসের লড়াই? কি নিয়ে লড়বেন? কার সঙ্গে?

খুকী বুঝিও না সীতা আমায়। পনের বছর হল স্বামীর আশ্রয় হারিয়েছি, সেই থেকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সংসার চালিয়ে এসেছি, ছেলে-মেয়ে মানুষ করছি। তুমি আমাকে যত বোকা ভাবো অত বোকা আমি নই।

এবার সীতা বুঝতে পারে। জোরে এমন নাড়া খায় তার মনটা। খানিকক্ষণ সে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে অনুরূপার মুখের দিকে। অনুরূপাকে তুচ্ছ না ভাবা সত্যই অসম্ভব মনে হয়, তার।

বোকা আপনাকে কখনো ভাবিনি মাসীমা, আজ বোকা মনে হচ্ছে। আমার সঙ্গে লড়বেন বলছেন না কি? আপনার বুদ্ধি সত্যি লোপ পেয়েছে। আমায় অপমান করুন তার মানে হয়, ও-কথা বলে নিজের ছেলেকে কত বড় অপমান করছেন বুঝতে পারছেন না? ছেলের আপনার নীতি নেই আদর্শ নেই জীবনে, একটা মেয়ের খাতিরে নিজেকে সে চালাচ্ছে? আমায়

খুসী করার জন্য আপনার বিরোধিতা করতে যাচ্ছে, তার ব্যবহারের আর কোন মানে নেই? নিজের ছেলেকে এমন অপদার্থ কি করে ভাবলেন? তাও যদি এতটুকু সত্যি হত কথাটা। আপনার মনের কথা আন্দাজ করলে হেমন্তেরি ঘেন্না ধরে যাবে জীবনে। একটা ভুল ধারণার বশে আমাকে হিংসা করে অশান্তি সৃষ্টি করবেন না মাসীমা। নিজেই জ্বলে পুড়ে মরবেন।

স্পষ্ট রূঢ়তার সঙ্গেই সীতা কথাগুলি বলে যায়, অনুরূপাকে রেয়াৎ করার কোন প্রয়োজন বোধ করে না। কড়া ভাষায় খোলা-খুলি সোজাসুজি না বললে তার কথার মর্ম্ম অনুরূপা গ্রহণ করতে পারবেন কি না, এ সন্দেহও তার ছিল। স্নেহের বাড়াবাড়ি মাকেও কোথায় নিয়ে যায় ভেবে বড় আক্ষেপ হচ্ছিল সীতার। এই সব মায়েরাই ছেলের বৌ-প্রীতির জ্বালায় পুড়ে মরে, সব দিক্ দিয়ে গ্রাস করে রাখতে চায় ছেলেকে চিরকাল। স্নেহ যায় চুলোয়, বড় হয়ে থাকে শুধু বিকারটা। মায়ের স্নেহও যদি এমন সর্ব্বনেশে হয়, সে কত বড় অভিশাপ মানুষের! তাও এমন মার, অন্তঃপুরের বন্দী জীবনে অন্ধ মমতা বিলিয়ে যাওয়াই শুধু যার কাজ নয়, একা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যে বাইরের জগতের সঙ্গে লড়াই করে আসছে পনের বছর ধরে, বাঁচবার জন্য, ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য। এমন বাস্তব যার জীবন, মা বলেই কি তার এতটুকু বাস্তববোধ জন্মায় নি ছেলে-

মেয়েদের বিষয়ে? এমন জন্যই নিজেকে ছোট করে মায়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না সন্তানের। তাই কি করতে হবে হেমন্তকে? নইলে যে সমস্যা সৃষ্টি করবেন অনুরূপা, তার সমাধান করা কি সম্ভব হবে হেমন্তের পক্ষে।

কিন্তু অনুরূপা কি সত্যই ও-রকম অশান্তি সৃষ্টি করবেন? হেমন্ত পাশ করে মোটা মাইনের চাকরী করবে, এ আশা তো ফুরিয়ে যায়নি একেবারে। অনিশ্চিত আশঙ্কাই শুধু পীড়ন করছে তাকে। শান্ত মনে সব কথা বিবেচনা করে দেখবার পরেও কি ছেলের দিক্‌টা খেয়াল হবে না অনুরূপার, মনে হবে না অত বড় উপযুক্ত ছেলেকে চলা-ফেরা মতামতের এতটুকু স্বাধীনতা না দেওয়া পাগলামির সামিল? স্নেহের শিকলে জোর করে হেমন্তকে হয়তো বেঁধে রাখা যাবে কিন্তু ফলটা তার ভাল হবে না মোটেই?

অনুরূপার নিজের মুখে লড়াই-এর উদ্ভট ঘোষণা শোনার পর এখনও যেন বিশ্বাস হতে চায় না সীতার যে, ব্যাপারটা তিনি সত্য সত্যই ও-রকম কুৎসিত করে তুলবার জন্য কোমর বেঁধে উঠে-পড়ে লাগতে পারবেন।

অসহায়ের মতই চুপচাপ বসেছিলেন অনুরূপা তার ধমকানির মত কথাগুলি শুনে। তার নীরবতা বা বসে থাকা কোনটার মানেই ধরতে না পেরে সীতা সংশয়ভরা চোখে

তার দিকে তাকায়। নিজের শান্তিও সে আবার অনুভব করে নতুন করে।

তোমার কথা শুনে একটু ভড়কে গেছি মা।

অনুরূপার ক্ষীণ ভীরু কণ্ঠ আশ্চর্য্য করে দেয় সীতাকে।

ভড়কে যাবেন কেন?

অনুরূপা একটু ইতস্ততঃ করে তেমনি শঙ্কিত সুরে অসহায় ভাবে বলেন, আমার ওপর রাগ করে হেমাকে ছেঁটে দেবার কথা ভাবছ না তো তুমি? আমি না শেষকালে দায়ী হই।

এ কথায় অন্য সময় হাসি পেত সীতার, এখন এ আবেদনের করুণ দিক্‌টাই তার মনে লাগে। তাকে ছেলের ভবিষ্যৎ বৌ হিসাবে ভাবতে ভাবতে কল্পনাটা অনুরূপার জোরালো বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে, হেমন্ত আর সে পরস্পরকে ভালবাসে, সব ঠিক হয়ে আছে তাদের মধ্যে। এ বিষয়ে দ্বিধা-সংশয়ের লেশ-টুকু নেই অনুরূপার মনে। হেমন্তকে বিগড়ে দেবার জন্য মনে মনে তাকে স্থির নিশ্চিত ভাবে দায়ী করে ক্ষেপে উঠবার কারণ হয় তো তাই।

বিয়ে না হতেই শাশুড়ী-বৌয়ের লড়াই!

একটা ব্রতের কথা মনে পড়ে সীতার। ছেলেবেলা মামাবাড়ী গিয়ে মামাতো বোন আর পাড়ার কয়েকটি ছোট ছোট মেয়েকে এই ব্রত করতে দেখেছিল। যমপুকুরের ব্রত—যুগ যুগ ধরে শাশুড়ীরা ছেলের বৌদের যত যন্ত্রণা দিয়েছে তারই বিরুদ্ধে

কচি কচি মেয়ের ব্রতের বিদ্রোহ! ব্রতের প্রচার কথাটা চমৎকার। বৌ চায় এ ব্রত করতে, শাশুড়ী বলে, না। কাজেই মরে শাশুড়ী নরকে যায়। নরকের কষ্ট সয় না---ছেলের বৌয়ের দয়ায় উদ্ধার পাওয়ার চেয়ে কোনমতে নরকের কষ্টও অনেক ভাল মনে করে প্রাণপণে সহ্য করতে চেয়েও সয় না। অগত্যা স্বপ্নে ছেলেকে বলে দিতে হয় যে করে হোক বৌকে দিয়ে ব্রতটা করিয়ে আমায় উদ্ধার কর। বৌ কম চালাক নয়, বলে, শাশুড়ী নেই এ ব্রত করতে যাব কেন মিছামিছি কষ্ট সয়ে উপোষ করে! একগা গয়না দাও, দুধ ভাত খাওয়াও তবে করব ব্রত! ব্রত কথায় সে কি ঝাল ঝাড়া শাশুড়ীর ওপর, আর তার মধ্যেই শাশুড়ীর বৌনির্যাতনের কি অকাট্য প্রমাণ! শাশুড়ী হল খুইদিয়া দাই!

আলো আলো খুইদিয়া দাই, ধানতলা দিলি না ঠাঁই।
আলো আলো খুইদিয়া দাই, মানতলা দিলি না ঠাঁই।
আলো আলো খুইদিয়া দাই, কলাতলা দিলি না ঠাঁই।

ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা পর্য্যন্ত হয় নি, তবু যেন অনুরূপা মরে না গিয়ে মোটা সোটা দেহটি নিয়ে জলজ্যান্ত বেঁচে থাকলেও নরক যন্ত্রণারই প্রতিকারে তাকে দিয়ে শাশুড়ী-উদ্ধারের ব্রত পালন করিয়ে নিতে চান!

একটা কথা ভেবে সীতা স্বস্তি পায়। ছেলের দিক্‌টা অনুরূপা বিবেচনা করবেন। এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার ভাবেসাবে। যত অন্ধই হোক তার স্নেহ, ওই বিবেচনাটাও তার আছে। ছেলেকে নিজের খুসীমত চালাতে চেয়ে উনি যে ভাবেই লড়াই করুন, হেমন্তকে অসুখী দেখলে, তার জীবনে অশান্তি এলে, নিজেই তিনি জিদ বিসর্জন দেবেন, সামঞ্জস্য খুঁজবেন। সে যা ভয় করছিল, অনুরূপার দিক্ থেকে সে ভয়ের কারণ নেই।

অথবা আছে? কি করে সুনিশ্চিত হবে সীতা, কি করে বিশ্বাস করবে এরকম মা, ছেলে-প্রাণ এ রকম মা, ছেলেকে বিব্রত দুঃখিত অসুখী দেখলে নিজের খেয়াল খুসীকে সত্য সত্যই ছাঁটাই করে ছেলের সঙ্গে আপোষ করবে? বিশেষ করে, যে ছেলের জন্য এতকাল মেয়েমানুষ হয়েও টাকা রোজগার করেছেন এত কষ্টে, এত দুঃখে। একবার যদি খেয়াল হয় যে ছেলে অকৃতজ্ঞ---আর কি তখন সহজ বুদ্ধি টিঁকবে অনুরূপার আপোষ করায় সংযম বজায় থাকবে? কে জানে। ভালটা আশা করাই ভাল।

অনুরূপার অদ্‌ভুত কথাই যেন পুরানো অন্তরঙ্গতা ফিরিয়ে আনে সীতার, সে হাসিমুখে শাসনের স্বরে বলে, কি আবোল-তাবোল বক্‌ছেন মাসীমা? যেমন আবোল-তাবোল ভাবছেন, কথাও বলছেন তেমনি। মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার।

বাড়ী যান তো। দাঁড়ান, কাউকে সঙ্গে দি, পৌঁছে দিয়ে আসুক।

থাক্, থাক্। আমি নিজেই যেতে পারব মা।

ভাগ্যে বৌমা বলে বসেন নি, সীতা ভাবে।

তাকি হয় মাসীমা? নকুল গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

অনুরূপা উতলা হয়ে পড়ছেন—এ খবরটা হাসপাতালে হেমন্তকে দেবার নামেই ব্যাকুল হয়ে অনুরূপা কেন বাধা দিয়েছিলেন বুঝতে পারলে, অনুরূপা সম্বন্ধে সীতা বোধ হয় আরও নিশ্চিন্ত হতে পারত। ছেলে পাছে মনে করে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এ ভয়টা কত জোরালো অনুরূপার মনে, কত সাবধান তিনি এ বিষয়ে, সীতা সেটা টের পেত। অত বড় ছেলে সন্ধ্যা-রাত্রে বাড়ী না ফিরলে ব্যস্ত হওয়া সঙ্গত হয় না, সীতার মুখে এ কথা শুনেই তিনি ভড়কে গিয়েছিলেন। তিনি উতলা হয়ে উঠেছেন, অস্থির হয়ে ছুটে বেরিয়েছেন খোঁজ নিতে, এ কথা শুনে তাঁর বাড়াবাড়িতে যদি বিরক্ত হয় হেমন্ত। এক দিন একটু দেরী করে বাড়ী ফেরার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত তার নেই ভেবে যদি ক্ষুণ্ণ হয়।

এত ভয়-ভাবনা নিয়েও কিন্তু এক বিষয়ে মনটা শক্ত করে রাখেন অনুরূপা। ছেলেমানুষী করে হেমন্ত নিজের সর্ব্বনাশ করবে, এটা চুপচাপ বরদাস্ত করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। বাধা তিনি দেবেন, সামলাবার চেষ্টা করবেন, যতটা তাঁর

সাধ্যে কুলোয়। সেজন্য যদি রাগ করে হেমন্ত, দুঃখ পায়, বিরক্ত হয়, উপায় কি।

মনের এই লড়ায়ে ভাবটা আগেও ছিল, এখনো আছে উদ্যত হয়ে, তবে সীতার শাসনটা কাজ দিয়েছে। হেমন্ত ফেরামাত্র লড়াই সুরু করে দেবার ঝোঁকটা সংহত হয়েছে। এত বড় ছেলেকে বাগাতে হলে সে যুদ্ধটা ধীর স্থির শান্ত সংযতভাবে করতে হবে সীতার মত, এ বিষয়ে মন সতর্ক হয়ে আছে। তাই, মায়ে ব্যাটায় সংঘর্ষ বাধতে বাধতে রাত্রি গভীর হয়ে আসে। রমা ও জয়ন্ত যতক্ষণ জেগে থাকে, অনুরূপা সাধারণ ভাবে কথা বলে যান, হেমন্তের কাজে তাঁর সমর্থন আছে কি নেই, সে ইঙ্গিতও আসে না তাঁর কাছ থেকে। হেমন্ত তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়, রমা ও জয়ন্ত হাঁ করে তার কথাগুলি গিলতে থাকে। অনুরূপাও নীরবে শুনে যান। মায়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করেও হেমন্ত কিন্তু সে বিষয়ে কিছু বলে না। মার দিক থেকে কথা ওঠা পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করাই সে ভাল মনে করে। মার চুপ-চাপ থাকার কোন কারণ আছে নিশ্চয়। আলোচনা সুরু হবার আগে নিজের মনটাকেই হয়তো গুছিয়ে নিচ্ছেন মা, হৃদয়কে শান্ত ও আয়ত্তাধীন রাখবার আয়োজন করছেন। তাড়াহুড়ো করে কথা পেড়ে কোন লাভ হবে না।

জয়ন্ত ঘুমিয়ে পড়ে আগে। পরে রমাও কয়েকবার হাই তুলে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। খাওয়ার পাট চুকেছিল

হেমন্ত বাড়ী ফেরার কিছু পরেই। তখন অনুরূপা কথা পাড়েন।

ঘুম পেয়েছে হেমা?

না মা। কি বলবে বলো।

আমাকে বলতে হবে?

হবে না? নইলে তোমার মনের কথা বুঝবো কি করে?

নতুন কথা শোনালি আজ। আমার মনের কথা বুঝিস না তুই? কপাল আমার।

শুনে হেমন্ত ভয় পেয়ে যায়। বুঝতে পারে, অনুরূপার কাছে আজ সে সহজে রেহাই পাবে না। নইলে তিনি এ-স্বরে কথা সুরু করতেন না। রাগ দুঃখ অভিমান অনুযোগ অভিযোগ কাঁদা-কাটা সব কিছু অস্ত্র সাজিয়ে মা প্রস্তুত হয়ে আছেন। আলোচনা গড়ে তুলে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার মার হাতে ছেড়ে দিলে আর রক্ষা থাকবে না, একেবারে মর্মান্তিক কাণ্ড করে ছাড়বেন তিনি। ভেবে-চিন্তে হেমন্ত নিজেই কথা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অনুরূপা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে হেমন্ত বলে, শোন, শোন। তুমি রাগ করেছ, মনে কষ্ট পেয়েছ, তোমার ভয় হয়েছে, সব আমি জানি মা। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। তর্কও করব না, তোমার কথার অবাধ্যও হব না। তুমি যদি বারণ কর কোন কাজ করতে, তোমার

কথা আমি মেনে চলব। গোড়াতে এ কথাটা স্পষ্ট করে বলে রাখলাম। এবার আসল কথা বলে তোমার মত চাইব। তুমি হাঁ কি না বলে দিও, বাস্, সেইখানে সব খতম হয়ে যাবে। আমরা আর ও নিয়ে মাথা ঘামাব না।

অনুরূপা একটু বিব্রত বোধ করেন। এ ভাবে কথা চালাবার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভাবতেও পারেননি হেমন্ত এতটুকু লড়াই করবে না, তাকে বুঝিয়ে দলে টানবার চেষ্টা পর্যন্ত বাতিল করে দেবে গোড়াতেই, সোজাসুজি তাঁরই ওপর সব সিদ্ধান্তের দায়িত্ব চাপিয়ে দেবে। পছন্দ হোক, অপছন্দ হোক, চোখ-কান বুজে তাঁর কথা মেনে চলতে সে প্রস্তুত, হেমন্তের এ ঘোষণায় এক দিকে হৃদয় যেমন তার উল্লাসে ভেসে যাবার উপক্রম হয়, অন্য দিকে তেমনি মতামত দেবার দায়িত্বটা যে তার কতদূর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অনুভব করে দুর্ভাবনারও তার সীমা থাকে না। শুধু মা হিসাবে অন্যায় আবদার করা চলত, যুক্তি-তর্ক শূন্যে উড়িয়ে দিলেও দোষ হত না। হেমন্ত যেন সে পথটা তার বন্ধ করেছে। মা বলে তাকে আকাশে তুলেছে বটে, আছাড় খেয়ে পড়বার সম্ভাবনাও সৃষ্টি করে দিয়েছে সেই সঙ্গে।

হেমন্ত শান্ত কণ্ঠে বলে, ঘটনা সব জানো। কাল একটা প্রোটেষ্ট মিটিং হবে, আমি তাতে যোগ দিতে চাই। মিটিং-এর

পর আর একটা প্রোসেসনও হয়তো বার হবে, তাতেও আমি থাকতে চাই। এখন তুমি যা বল।

তুই কি লেখাপড়া করতে চাস না?

কেন? তার মানে কি?

এ সব করে বেড়ালে লেখাপড়া হবে কি করে?

ও। এই কথা। হেমন্ত এবার হাসে, রোজ এ সব করে বেড়াব না কি? এ সব করা মানে তো শুধু এই যে, একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ওটুকু না করলে কি মনুষ্যত্ব থাকে? লেখাপড়ার অজুহাতে মনুষ্যত্ব ছেঁটে ফেলতে পারি না মা, তুমি যাই বলো। হাঙ্গামা যে হচ্ছে, সে দোষ আমাদের নয়।

কিন্তু হচ্ছে তো। আজ সামান্য চোট লেগেছে, কাল তো মারা যেতে পারিস।—সোজাসুজি মৃত্যুর কথাটা বলে যান অনুরূপা, গলায় আটকায় না, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে হেমন্ত বুঝতে পারে যে, কথাটা বলতে কি উগ্র আতঙ্কে মড় মড় করে উঠেছে তাঁর দেহ-মন।

হেমন্ত মৃদু স্বরে বলে, হয়তো—সম্ভব। তোমায় মিথ্যে ভরসা দেব না।

তবে?

শোন তবে বলি তোমায়, হেমন্ত যেন দম বন্ধ করে কথা বলে, এই ভাবের ভয়ভাবনার জবাবটা আজ পেয়েছি মা, এত

দিন পরে। লেখা-পড়ার জন্য কি সব ছাড়া যায়? তোমাকে কিম্বা রমাকে যদি একটা গুণ্ডা আক্রমণ করে, আমি যদি স্পষ্ট বুঝতে পারি তোমাদের বাঁচাতে গেলে লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটে যাবে, ব্রেণটা খারাপ হয়ে যাবে, জীবনে লেখাপড়া কিছু আর হবে না আমার —তাই ভেবে কি তখন চুপ করে থাকব? কি হবে সে লেখা-পড়া নিয়ে আমার। তবে এটাও ঠিক যে, ও হল বিশেষ অবস্থা। অবস্থাবিশেষে লেড়াপড়ার কথা ভাবারও মানে হয় না লেখাপড়া করাই যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই বলে সাধারণ অবস্থায় লেখাপড়া করব না কেন? তাই তো কাজ আমার।

অনুরূপা গুম খেয়ে থাকেন।

যাক্‌গে, হেমন্ত স্বাভাবিক গলায় বলে, বলেছি তো তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। তুমি যা বল—হাঁ কিম্বা না।

মরতে পারিস জেনেও হাঁ বলতে পারি আমি? অনুরূপা আর্ত কণ্ঠে প্রায় চীৎকার করে ওঠেন।

সেটা কঠিন বটে তোমার পক্ষে বলা, হেমন্ত স্বীকার করে নেয়, এক কাজ কর তবে। হাঁ না কিছুই তুমি বোলো না। আমার ওপরে সব ছেড়ে দাও, আমি যা ভাল বুঝব করব। তাই কর মা।

অনুরূপা নিশ্বাস ফেলেন।—এ আমি আগেই জানতাম হেমা, তোর সঙ্গে পারব না।

এই ভাবে একটা বোঝা-পড়ার মধ্যে মা ও ছেলের সংঘর্ষটা বেঁচে রইল। মার অনুমতি মানেই আশীর্ব্বাদ। সেটা জুটলো না হেমন্তের। তবে নিষেধের অভিশাপ যে এল না, অনুরূপার মত ভদ্র স্নেহাতুরা মায়ের এ পরিবর্ত্তন কে অস্বীকার করবে? কে বুঝতে পারবে না যে, অনুরূপার পক্ষেই সম্প্রতি সন্তানকে আশীর্ব্বাদ দেওয়া সম্ভব হবে, আচছা মরবে যাও, এর চেয়ে মহান্ মৃত্যু মা হয়ে কি করে কামনা করি তোমার জন্য?

হাতটা গেছে? জীবনে আর সারবে না? আমিনার আর্ত্তনাদ যেন চিরে দেয় ঠাণ্ডা মাঝরাত্রি।

একটা হাত তো আছে। রসুল বলে জোর দিয়ে।

তা আছে।

আমিনা আত্মসম্বরণ করেন আর্ত্ত-চীৎকারে ফেটে পড়বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। মাঝরাত্রে এভাবে হঠাৎ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা গলায় ঝুলানো নষ্ট হাত নিয়ে রক্তমাখা জামা-কাপড় পরা ছেলে হাজির হলে কোন্ মা আত্মহারা না হয়ে পারে? তবে নিজেকে সামলাবার ক্ষমতা আমিনার অদ্ভুত। ছেলেটা আজাদির জন্য অনায়াসে মরতে পারে, মরবার জন্য তৈরী হয়ে আছে, টের পাবার পর থেকে আমিনার মনের এই জোরটা হু-হু করে বেড়ে গেছে।

আদর খেতে এলাম, আমায় মোটে আদর করছ না মা।

তোর মা হওয়ার যা ঝকমারি, আদর করতে মোটে ইচ্ছে যায় না রসুল্।

রসুলের মাথাটা আরও জোরে বুকে চেপে ধরে আমিনা বলেন, হাসপাতালে গেছিস জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। জানি তো এমনি ভাবে যাবি একদিন, দু'দিন আগে আর পরে। আগে গেলেই বরং চুকে-বুকে যায় সব। তোকে পুড়তে হয় না চব্বিশ ঘণ্টা মনে মনে, আমাকেও পুড়তে হয় না চব্বিশ ঘণ্টা তোর কথা ভেবে ভেবে—

মা, জানো? ফিস-ফিস করে রসুল বলে।

তেমনি ফিস-ফিস করে আমিনা বলেন, কি?

আমায় আটকে দিয়েছিল হাসপাতালে। তোমায় দেখতে কেমন করতে লাগল মনটা। চুপি চুপি পালিয়ে এসেছি।

অঁা? ডাক্তার বলেছিল শুয়ে থাকতে, চুপি চুপি তুই পালিয়ে এসেছিস এই রাতে এক মাইল পথ হেঁটে?

তোমার একটু আদর না পেলে কি এ যন্ত্রণা সয়?

রসুল বুঝতে পারে, মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। বেশী রক্ত বেরিয়ে যাবার ফলে একদিকে যেমন দুর্বল অশক্ত মনে হচ্ছে শরীরটা, তেমনি আবার কেমন অদ্ভুত রকমের ভোঁতা অবসন্নটা এসেছে অনুভূতিতে। আমিনার কান্না যে অগাধ ও অসহনীয় বিষাদে হৃদয় ভরে দেয়, রসুল জানে সেটা সাময়িক ও কৃত্রিম। রক্তক্ষরণের ফলে শুধু এই প্রতিক্রিয়া এসেছে। নইলে এত রাত্রে এসে মাকে কাঁদাতে তার মোটে ভাল লাগত না, এলেও কাঁদাবার বদলে নিজেই সে হৈ-চৈ হাঙ্গামায় অস্থির করে ভুলিয়ে রাখত মাকে। কিন্তু আজ এমন দুর্বল হয়ে গেছে মনটা যে মাকে আরও বেশী কাঁদিয়ে দুঃখটা উপভোগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ডাক্তার সত্যি বলেছিল যে, রক্তক্ষয়ের কতগুলি অদ্ভুত খাপছাড়া প্রতিক্রিয়া আছে—নিজেকে হঠাৎ অতিরিক্ত সবল মনে করে

সে যেন বিছানা ছেড়ে উঠবার চেষ্টা না করে। তাই সে করেছে শেষ পর্যন্ত! বেড ছেড়ে উঠে এক মাইল রাস্তা হেঁটে মাকে কাঁদাতে এসেছে!

দাঁতে দাঁত ঘষে রসুল মনে মনে বলে, না, বিকারের ঝোঁকে মাকে সে কাঁদাতে আসেনি, ভেবে-চিন্তে যা করেছে সে কাজকে ওই সস্তা দুর্বলতায় পরিণত হতে সে দেবে না, রক্ত ক্ষয় হবার জন্য তো নয় শুধু, গ্রেপ্তার হওয়ার জন্যও বটে। হাসপাতালে গ্রেপ্তার না হলে কি তার মাকে এ ভাবে দেখতে আসবার ঝোঁক চাপত! আবার কবে দেখা হয়, মার মনে একটু শান্তি ও শক্তি দেবার চেষ্টা করা তার উচিত, এ সব হিসাব করেই সে এসেছে মাকে দেখতে। মাকে কাঁদিয়ে খুসী হয়ে যেতে নয়।

তবে তুমি কাঁদো, আমি যাই।

কাঁদছি কই।

এবার যে কথা বলব শুনে কিন্তু ভেউ-ভেউ করে কাঁদবে।

—ইস্!

না সত্যি। হাঙ্গামার কথা। সেই জন্য তো রাত দুপুরে পালিয়ে এলাম তোমায় দেখতে।

সুতরাং তখন মনটা শক্ত করতে হল আমিনার। চোখের জল চলে গেল আড়ালে, অন্য সময়ের জন্য। ছেলে যদি মুস্কিলে পড়েই থাকে, তাকে এখন সাহস যোগানো দরকার, নিজের দুর্বলতা দিয়ে তাকে কাবু করে আনা সঙ্গত হবে না। রসুলও

জানত, তার বিপদের খবর শুনে মার পক্ষে আত্মসম্বরণ করা সহজ হবে। হাতে গুলি লেগেই সব শেষ হয়নি, এখনো হাঙ্গামা সঞ্চিত আছে তার জন্য, একথা শুনলেই মার কান্না স্থগিত হয়ে যাবে।

আমাকে গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রেপ্তার? কেন?

হাঙ্গামায় ছিলাম বলে।

তোর হাতে গুলি লাগল, তোকেই গ্রেপ্তার করল কি রকম?

ওই তো খাঁটি প্রমাণ যে আমি হাঙ্গামায় ছিলাম। নইলে আহত হব কেন?

—বাঃ, বেশ!

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে রসুল। শরীরটা সত্যই বড় দুর্বল লাগছে। মনে কোন কষ্ট নেই কিন্তু শান্ত গম্ভীর সেই করুণ বিষাদের ভাবটা কাটছে না।

আনমনা ছেলের চুলের ভেতরে আঙুল দিয়ে আমিনা তার মাথাটা তোকিয়ে দেন ধীরে ধীরে। মনে অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভিড় করেছে। তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র জিজ্ঞাসা করা যায়, বাকীগুলি চিরকাল অবোধ আকুল মনের প্রশ্ন হয়েই থাকবে।

গ্রেপ্তার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল?

না, হাসপাতালে গ্রেপ্তার করেছে।

জামিন দিল?

না, আমিন দেয়নি।

তবে?

পালিয়ে এসেছি, তোমার জন্যে। ভোরে আবার ফিরে যেতে হবে।

কেন? ফিরে যাবি কেন?

যাব না? আরও তো কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে, তারা কেউ পালায়নি। ফিরে না গেলে লোকে বলবে না তোমার ছেলে গ্রেপ্তার হয়ে একা পালিয়েছে?

তবে এখন ঘুমো, আর কথা নয়।

আমিনাও কিছু কিছু বুঝতে পারেন যে আঘাতের ও রক্ত-পাতের ফলে এমন কোন একটা প্রক্রিয়া ঘটে গেছে রসুলের মধ্যে যার ফলে হঠাৎ মাকে কাছে পাবার ঝোঁক জাগায় নিজেকে সামলে রাখতে অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু পেরে ওঠেনি। শিশুর মত কেন রসুল এমন পাগল হয়ে উঠল মায়ের জন্য? আর দশটি শান্ত-শিষ্ট ভাল ছেলের মত হয়ে না থেকে এই সব বিপজ্জনক আজাদির ব্যাপারে যোগ দিয়ে দুঃখিনী মাকে আরও দুঃখ দিচেছ, এ রকম কোন কাঁটা কি আছে ওর মনে তিনি তো কোন দিন সমালোচনা করেন নি, আপশোষ জানান নি। ও-রকম নিরীহ গোবেচারা ছেলেই বা ক'জন আছে দেশে যে, তাদের সঙ্গে তুলনায় দেশের ও দশের জন্য নিজের মাকে কষ্ট

দেবার চেতনা ওর লেগেছে। আমিনার তো মনে হয় দেশের সব ছেলেই তার রসুলের মত---অন্য কোন পথ তাদের নেই। আচ্ছন্ন অভিভূতের মত রসুল ঘুমিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট কাতর শব্দ বার হয়। আমিনা জেগে বসে চুপ করে চেয়ে থাকেন তার রক্তহীন বিবর্ণ মুখের দিকে। তার অশ্রুহীন দুটি আরক্তিম চোখে শুধু ইঙ্গিত ফুটে থাকে হৃদয় তার কি ভাবে রক্তাক্ত হয়ে আছে।

শেষ রাত্রে আবদুল ঘরে ঢোকে।

এবার যেতে হবে রসুল।

হেঁটে ফিরতে পারবে? আমিনা বলেন।

না, হাঁটিতে হবে না। গাড়ীর ব্যবস্থা করেছি।

আবদুলেরও ঘুম হয়নি, তার চোখ দুটিও টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সে চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঘুমন্ত সহরের শেষ রাত্রির স্তব্ধতা যেন প্রশ্ন হয়ে ওঠে আমিনার কাছে: তোর কি শুধ একটি ছেলে?

কে নিজের ছেলে কে পরের ছেলে ভাববার ক্ষমতা নিজের ছেলেই তার লোপ পাইয়ে এনেছে ক্রমে ক্রমে। অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে আহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে। আর এমন এক বন্ধুকে সঙ্গে এনেছে রসুল, দু'দণ্ড যার মুখখানা দেখে মনে হচেছ, রসুলের মতই সে তার চেনা-জানা, নিজের বুকের রক্ত ঢেলে মানুষ-করা সন্তান।

সুধাই বাইরের দরজা খুলে দেয় প্রতি রাতের মত। মুখ খুলে ব্যথিত ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আজ আর তাকায় না অন্য দিনের মত, পাশে সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে মাথা হেঁট করে থাকে।

অক্ষয় উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই?

কি জানি। চেঁচামেচি জুড়ো না।

তোমার হল কি?

সুধা জবাব দেয় না। মাথাও সে হেঁট করেই রাখে। অক্ষয় চৌকাট পার হয়ে ভেতরে এলে নিঃশব্দে সদর দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে যায়। অক্ষয়ের অনুভূতি হয় দু'রকম। তার নেশা করার জন্য সুধা কষ্ট পায় সে জানত, কিন্তু কত তীব্র, কি অসহ্য যে হত সে কষ্ট তা সে শুধু আজকে, এখন, সুধাকে চোখে দেখবার পর, প্রথম পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছে। আজ অবশ্য সুধার মনে আঘাত লেগেছে চরম, আজকের লজ্জা দুঃখ হতাশার তার সীমা নেই, মনে মনে আজ সে মরে গেছে। আজ অক্ষয় শুধু মদ খেয়ে আসেনি, আর কোনদিন ও-জিনিষ স্পর্শ করবে না এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে খেয়ে এসেছে। আজ তার বিশেষ দুঃখ, বিশেষ হতাশা, কিন্তু আগেও কি কম ছিল? অধঃপতন সুরু হয়ে গিয়েছে স্বামীর, দিন দিন বাড়ছে তার নেশা, কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা কি ভাবতে পারত সুধা? আগে এতটা অনুমান করতে পারেনি বলে, অনুমান করতে চায়ওনি বলে, অক্ষয়ের সমবেদনা ছিল জলো খেয়াল। হালকা

মেঘের মত সে সমবেদনা খুশী মত মনে ভেসে আসত, দরকার মত উপে যেত। পশুর মত কি ভাবে সুধাকে সে নির্য্যাতন করে এসেছে, এত কাল পরে আজ প্রথম পশুর মত জমজমাট নেশা না করে বাড়ী ফিরে হঠাৎ সেটা অনুভব করে আজ প্রথম আন্তরিক অনুতাপ দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে। তবু তারি মধ্যে সে বুঝতে পারে যে এ অনুতাপের তীব্র মধুর জ্বালা জেগেছে শুধু এইজন্য যে আজ সে মদ খেয়ে আসে নি, আজ তাকে মদ না খেয়ে আসার নেশায় ধরেছে। কাল যদি ওজনমত, আজ বাদ গেছে বলে খানিকটা বেশী খেয়ে আসে, সুধাকে পশুর মতই নির্য্যাতন করবে। তার কালকের কাণ্ডের জন্যই সুধা আজ বেশী রকম ভয়ার্ত্তা হয়ে আছে। কাল বাড়ী ফিরেই সে ফতোয়া দিয়েছিল : ঝুলো মাই, বুড়ী মাগী, শাড়ী সেমিজ পরে কচি বৌ সাজতে লজ্জা করে না? খোল্. খোল্, শীগগীর খোল!

সুধা তা ভুলতে পারে নি। সুধা আজও আশঙ্কা করছে ওই রকম একটা ভয়ঙ্কর মাতলামির। শুধু সেটা কিভাবে আসবে ঠাহর করে উঠতে পারছে না।

প্রায়শ্চিত্ত বাকী আছে তার, অনেক প্রায়শ্চিত্ত। নিজেকে অনেক দিন ধরে দলে পিষে ছিঁড়ে ধুনে চলতে হবে। নেশা করার দুরন্ত, অবাধ্য দৈহিক মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন সাধ শুধু নয়, সে যে মাতাল হওয়া বরবাদ করেছে এ বিষয়ে বহু কাল ধরে ঘরে বাইরে সকলের অবিশ্বাসের পীড়ন। মাথাটা আজ যেন

আশ্চর্য্য রকম সাফ মনে হয় অক্ষয়ের। জগতের যাবতীয় সমস্যার মর্ম যেন তার আজ মদ খাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও না খাওয়ার এবং এ নেশা যেভাবেই হোক ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞার বিদ্রোহে অকস্মাৎ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে জীবনে—কঠিন, কঠিন এ কাজ।

কিন্তু অন্য এক ভয়ঙ্কর নেশাতে একেবারে সচেতন অচেতন মন নিয়ে মসগুল হওয়ার মজাও টের পেয়েছে অক্ষয়, বাঁচার জন্য বাঁচাবার জন্য গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মরা। এই প্রথম ও নতুন নেশা এত সাফ করে দিয়েছে তার মাথা যে সে জেনে গিয়েছে মদ হয় তো সে খাবে দু' একবার নিজের দুর্ব্বলতায় কিন্তু সেটা দু' একবারের বেশী আর খাবে না, কারণ, ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীয়ন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচেছ ---গেঁজানো রক্ত।

এমনিভাবে উদ্ভট প্রক্রিয়া চলে অক্ষয়ের মনের।--- তবে পরম মুক্তির, মহান্ আত্মজয়ের, দু:স্বপ্নের অবসানের বাস্তব, কার্য্যগত জীবন্ত অনুভূতিও আজ খুব প্রবল অক্ষয়ের। মিথ্যা ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে সুধার মৃত্যু-ম্লান মুখে জীবনের জ্যোতি, আশার আলো ফুটিয়ে তোলার কল্পনা তার হৃদয়কে উৎসুক, উৎফুল্ল করে রেখেছে—প্রথম প্রেমে প্রিয়াকে পাওয়ার সম্ভাবনা আবিষ্কার করে ফেলার মতই রসালো সে আনন্দ। জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে

সে সুধাকে দেখতে থাকে। খাটে বসে মেঝেতে চোখ বিঁধিয়ে রেখেছে সুধা। বিছানায় উঠে কেন সে শুয়ে পড়ছে না দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, অক্ষয় তা বুঝতে পারে। রাত দুপুরে মাতাল অক্ষয়কে সামলাবার দায়িত্ব সুধা পালন করে এসেছে বরাবর, রাত দুপুরে বাড়ী ফিরে সে যাতে নেশার ঝোঁকে হৈ-চৈ কেলেঙ্কারি কিছু না করে। অক্ষয় না শুয়ে পড়লে সে শোয় না, অক্ষয় না ঘুমোলে সে ঘুমোয় না। আজ সে মরে গেছে অক্ষয়ের কাণ্ডে, তবু আজও তার সে দায়িত্ব পরিহার করতে সে পারছে না। হৃদয়-মনে কোটি বসন্ত আসে অক্ষয়ের। তার মনে হয়, আজ সে নেশা করায় অপরাধ করেনি জানিয়ে কয়েক বছরের পুরানো বৌকে সে খুসী করবে না, আমি তোমায় ভালবাসি বলে এই আশাহীনা লজ্জিতা অপমানিতা মেয়েটিকে সে আজ পুলকিতা রোমাঞ্চিতা করে তুলবে। আজ তাদের আবার বিয়ে হবে নতুন করে।

মা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন সুধা?

কি জানি।

বোসো। এখুনি আসছি।

কোথা যাবে? সুধা আর্তনাদ চেপে বলে।

মাকে প্রণাম করে আসি।

বলে অক্ষয় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বারান্দার কোণ ঘুরলেই মার শোবার ঘরের দরজা—মা আর অক্ষয়ের বোন

ললিতা শোয় ও-ঘরে। বারান্দার কোণটা ঘুরবার সময় সুধার দেহটা একেবারে পায়ের ওপর এসে পড়ায় অক্ষয়কে থামতে হয়।

পায়ে পড়ি তোমার, রাত দুপুরে কেলেঙ্কারি কোরো না। মা ঘুমুচ্ছেন।

অক্ষয় বলে, আরে! কি করছ তুমি। এত রাতে ফিরে মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছি কেন বুঝতে পারছ না? আজ খেয়ে আসিনি। মা খুসী হবেন শুনে।

ঘুম ভাঙ্গালে মার শরীর খারাপ হয়। কাল সকালে মাকে প্রণাম কোরো।

অক্ষয় আহত হয়, সুধা বিশ্বাস করেনি।

সত্যি খাইনি সুধা।

জানি। কিন্তু মাকে ঘুমোতে দাও। ঘরে চল।

চল। আগে তোমাকে বোঝাতে হবে দেখছি।

ঘরে গিয়ে সুধা বলে, এক কাজ কর, কেমন! শুয়ে পড়ি এসো। আমারো ঘুম পেয়েছে, দুজনে শুয়ে পড়ি।

খাব না?

খেয়ে আসোনি? অন্য দিন তো—। এসো তবে, বোসো।

সুধা তাড়াতাড়ি আসন এনে পেতে দেয়—ঘরের কোণে অন্ন-ব্যঞ্জন ঢাকা ছিল, আসন ভাঁজ করা ছিল আলনায়। খাড়ী

ফিরে অক্ষয় কদাচিৎ খায়, কিন্তু আহার্য্য তার প্রস্তুত হয়ে থাকে প্রতিদিন। খাক বা না খাক।

অক্ষয় ধীরে ধীরে আসনে বসে। সাজিয়েগুছিয়ে সব ঠিক করে সামনে দেবার পরও সে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। সুধার গৃহিণীপণা দেখতে দেখতে চোখে তার পলক পড়ে না। সে আজ সত্যই গন্ধও শোঁকেনি মদের। কিন্তু সুধা জানে সে মাতাল হয়ে এসেছে। জেনেও সুধা হাল ছাড়েনি, বিশ্বাস হারায়নি, আশা বাদ দেয়নি। মরে তো সুধা তবে যায়নি, আজ সে মদ খেয়ে এসেছে জেনেও, যা সে ভাবছিল এতক্ষণ। তার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের আঘাত পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সে আঘাত সামলে নিয়ে সুধা তো আবার আশা করেছে। আজ পারেনি, কাল হয়তো পারবে, কিম্বা দু'দিন দশ দিন না পেরে ক্রমে ক্রমে এক দিন হয় তো পারবে, ইতিমধ্যেই এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে সুধা জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রচনা করছে বাঁচবার অপরাজেয় প্রেরণায়।

মরা সোজা, তাই সে ভেবেছিল আজ যদি সে মদ খায়, সুধা সোজাসুজি মরবে। সে কি জানত জীবনকে এত বেশী শ্রদ্ধা করে সুধা যে, মরা সহজ মনে হলেও বাঁচবার জন্য সে এমন ভাবে লড়বে চরম হতাশায় আশা না ছেড়ে, ব্যর্থতার পরম প্রমাণকে শেষ বলে ধরে না নিয়ে? সাধারণ পতিপ্রাণা বৌ বলে সুধাকে জানত অক্ষয়। তাকে অসাধারণ সে ভাবতে

পারে না এখনো। কিন্তু জীবনে আজ প্রথম জীবন-যুদ্ধে সাধারণ একটি নারীর স্বাভাবিক সংগ্রাম-শক্তির স্বরূপ আঁচ করে সে স্তম্ভিত, অভিভূত হয়ে যায়।

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি তোমার?

হচ্ছে বৈ কি, বাঃ! খাও।

সত্যি বলছি, খাইনি আজ। তোমার কাছে কিছু গোপন করব না। খাইনি বটে, কিন্তু তাতে আমার বাহাদুরী নেই। খাব না বলেছিলাম বলে খাইনি, তা সত্যি নয়। খাবার জন্য হোটেলের দরজা পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। অন্য দিনের চেয়ে বেশীই হয় তো আজ খেতাম সুধা। কিন্তু এমন ব্যাপার আজ দেখলাম, যাদের মেয়ে-শোঁকা ভাবপ্রবণ ফাজিল ছোকরা বলে জানতাম, তাদের এমন অদ্ভুত মনের জোর দেখলাম, আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম সুধা। বুঝলাম যে, আমি যা ভাবি সব ভুল। মদ খেতে হোটেলের দরজা পর্য্যন্ত গেলাম, কিন্তু তখনো ভাবছি, গুলি খেলে মরতে হবে জেনেও সাধারণ একটা ছেলে যে গুলি খাবার জন্য তৈরী, ওটা কিসের নেশা? মদ না খেয়েও যদি মানুষের ও-রকম নেশা হ'তে পারে, আমি তবে কেন বোকার মত গাঁটের পয়সা খরচ করে এই সস্তা বিশ্রী নেশা করি! ওই ছেলেগুলোর জন্য আজ খেতে পারলাম না। আমার মনের জোরের জন্য নয়।

বেশ তো, বেশ তো, সুধা বলে শ্রান্ত-ক্লান্ত ব্যাহত গলায়, শুনব'খন সব কথা কাল। খেয়ে নাও।

অক্ষয় স্তম্ভিত হয়ে থাকে। সুধা এখনও বিশ্বাস করেনি। তার কথা আবোল-তাবোল ঠেকছে সুধার কাছে! তার কথা শুনে সুধার বিশ্বাস শুধু আরও দৃঢ় হয়েছে যে আজ সে অন্য দিনের চেয়ে বেশী মদ খেয়েছে, হৈ-চৈ করার স্তর পার হয়ে উঠে গিয়েছে দার্শনিকতার স্তরে।

মদ খেলে মুখে গন্ধ থাকবেই সুধা।

কেন ভাবছ। গন্ধ কেউ পাবে না। কাল, সকালে সেই গার্গল আর—

গন্ধ পাচ্ছ?—অক্ষয় মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুধাকে নিশ্বাসের গন্ধ শোঁকায়। আগেই এ প্রমাণ তার দেওয়া উচিত ছিল সুধাকে। ভাবপ্রবণ, অভিমানী, বিকারগ্রস্ত মন তার, তাই না সে চেয়েছে বড় বড় কথার প্যাঁচে সুধাকে বিশ্বাস করাতে —রাত দুপুরে যে ধরণের কথা বললে অজানা লোকেরও সন্দেহ হবে লোকটা মাতাল।

সত্যি খাওনি তো তুমি।

সত্যি খাইনি।

মুখের চেহারা বদলিয়ে সুধা তার দিকে চেয়ে থাকে। এতক্ষণে বিশ্বাস করেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তার এত বড় সৌভাগ্য কি করে সম্ভব।

একদিন না খেলে কি হয়?

তা ঠিক।

সহজ ভাবেই সায় দেয় অক্ষয়। তার অভিমানও হয় না, রাগও হয় না। একদিন সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে সুধা সেটা সহ্য করে এই জন্য যে, একদিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা চরম নয়, শেষ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞাটা রাখাই আসল কথা। এটা অক্ষয় আজ জেনেছিল খানিক আগে। তাই একদিন আজ সে মদ খায়নি এটা যে অসাধারণ ব্যাপার কিছু নয়, কাল পরশু তরশু যদি না খেয়ে থাকতে পারে তবেই জানা যাবে সে সত্য সত্যই জয়ী হয়েছে, সুধার এই ইঙ্গিত তাকে ক্ষুণ্ন করে না। সুধা ঠিক কথাই বলেছে। কেউ ঠিক কথা বললে খুসী না হওয়া বোকামি।

বোকামিকে প্রশ্রয় দিতে আজ রাত্রে অন্তত: অক্ষয় একেবারেই রাজী নয়।

মাকে প্রণাম করার ঝোঁকটাও তার কেটে গেছে। এমন এক যায়গায় উঠে গিয়েছিল তার মনটা সেখানে কোন মনেরই বাস্তব আশ্রয় নেই, সুধার কল্যাণে সেখান থেকে নেমে এসে সে এখন বুঝতে পারছে সে মদ খেয়ে আসে নি বলে রাত দুপুরে মাকে ঘুম থেকে তুলে প্রণাম করতে গেলে সে পাগলামিকে লোকে চেনা মাতালের মাতলামিই মনে করবে।

অনেক দিন পরে এমন সাদাসিদে সহজ কথা সাদাসিদে সহজ ভাবে ভাবতে বড় ভাল লাগে তার। যদিও ঝোঁকের

অশান্তি, সব কিছু থেকে বঞ্চিত হবার সব কিছু ফুরিয়ে যাবার উৎকট অনুভূতি, মনকে খিঁচে রাখা পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধ আতঙ্ক সে মাথা কপাল খুঁড়লেও আজ রাত্রে এক চুমুক পাওয়া যাবে না, এসব পুরো মাত্রায় বজায় আছে।

গাঢ় নীল বৈদ্যুতিক আলোয় লেখা 'বিদ্যুৎ লিমিটেড' সাইনটা বহু দূর থেকে চোখে পড়ে। প্রকাণ্ড চওড়া নতুন রাজপথ, দু'দিকে বিরাট অট্টালিকা, মোড় থেকে যত দূর চোখ যায় সিধা চলে গেছে। সহরের উন্নতির আধুনিক চিহ্ন। আঁকা-বাঁকা নোংরা গলি আর বস্তিগুলিকে অট্টালিকার পিছনে আড়াল করে রেখে সহরে যে বড়লোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে তার এই সব প্রমাণ-স্থষ্টির পরিকল্পনা যুদ্ধের কিছু আগে কার্য্যকরী হচ্ছিল। যুদ্ধ বাধলে অবশ্য সব স্থগিত হয়ে যায়। বিরাট বিরাট লোহার কঙ্কালগুলি আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে কত অকস্মাৎ গঠনের প্রচেষ্টা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের সময় এ সব রাস্তাও ছিল অন্ধকার! যুদ্ধের পর এখন আবার অমাবস্যার রাতেও পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বিতরণ করতে আরম্ভ করেছে অসংখ্য চোখ ঝলসানো আলো।

'বিদ্যুৎ লিমিটেড' তিনতলা বাড়ীটির নীচের তলায় রাস্তার দিকে পাঁচটি বড় বড় দোকানের একটি। এন, দাশগুপ্তের প্রকাশ্য ব্যবসা-কেন্দ্র এই বিদ্যুৎ লিমিটেড। তার আরও অনেক অপ্রকাশ্য ব্যবসা যুদ্ধের সময় ছিল, এখনো আছে--- কারণ, একথা সবাই জানে যে যুদ্ধ থামলেও অনেক চোরাগোপ্তা কারবারের স্থদিনের জের মহাসমারোহে চলেছেই বেশ কিছুকাল চলবার ভরসা রেখে। উপরে উত্তরের দিকে দোতলার ফ্ল্যাটে সে বাস করে। ঠিক উপরের তেতালার

ফ্ল্যাটটাও অন্য নামে সে ভাড়া করে রেখেছে। অনেকের উপকারের জন্য ওখানে বেনামী ঘরোয়া হোটেল, নাইট ক্লাব ও বার চালু আছে। অনেক পদস্থ লোক সন্ধ্যার পর সঙ্গিনী নিয়ে আসে, কেউ থাকে, কেউ চলে যায়। অনেক পদস্থ লোক মাঝ রাত্রে সঙ্গিনীকে নিয়ে কোথায় যাবে ভেবে না পেলে, অন্য পদস্থ লোকের কাছে আগে থেকে নির্দ্দেশ পাওয়া থাকলে, নির্ভয়ে এখানে এসে জোটে, খাদ্য পানীয় ঘর শয্যা সব কিছু তার জোটে। কোন কিছুর অভাব ঘটে না।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে বহুক্ষণ দাশগুপ্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করে শূন্যে তাকিয়ে থাকে। এ সব ব্যবসায়ে এইগুলি হল আসল হাঙ্গামা---সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারের অভাবনীয় পরিণতি। দশ-বিশ-পনের হাজার টাকার কত বড় বড় ডিল কত সহজে আপনা থেকে হয়ে যায়, ভীষণ রিস্ক নিয়েও এক মুহূর্ত্তের দুর্ভাবনা দরকার হয় না। আর সামান্য কয়েক শ' টাকার ব্যাপারে এই রকম ফ্যাকড়া বাঁধে। গণেশ আগেও কতবার মাল পৌঁছে দিয়ে এসেছে ওই সায়েবের বাড়ীতে। স্বপ্নেও কখনো সে ভাবতে পারেনি গণেশ রাস্তার হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে তাকে এ ভাবে হাঙ্গামায় ফেলবে।

ভাবলেও গা জ্বালা করে দাশগুপ্তের। যে দিক্ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা করেনি, ঠিক সেই দিক্ থেকে এই বিপদ

এল। দুর্ভাগ্য ছাড়া কি বলা যায় একে। জ্বালা বেড়ে গেল এই ভেবে যে, গেঁয়ো ছেলেটা বোধ হয় নিছক কৌতূহলের বশেই রাস্তার হাঙ্গামা হৈ-চৈ দেখতে দাঁড়িয়েছিল, গুলি লেগে যে বজ্জাত ছোকরাগুলো নিছক বজ্জাতি করার ঝোঁকে গুলির সামনে বাহাদুরি করছে তাদের বদলে সেই গেল মরে! ওর নাম-ঠিকানা-পরিচয় আবিষ্কার করতে গিয়ে এখন বেরিয়ে পড়বে তারা চোরা মাল চালান! হাসপাতালে কে তাকে খাতির করে? কে অনুভব করবে যে ব্যাপারটা চাপা দেওয়া দরকার? হয়তো হৈ-চৈ পড়ে যাবে। হয়তো কোন উপায় থাকবে না তাকে টানাটানি না করে! নিজেদের বাঁচাবার জন্য বাধ্য হয়ে হয়তো তাকেই বলি দেবে বড় কর্ত্তারা, যাদের হাতে নোট পাবার হাত চুলকাণি শান্ত করতে তার প্রাণান্ত।

কিছুই হয়তো হবে না তার শেষ পর্য্যন্ত, সামলে নিতে পারবে। কিন্তু দাশগুপ্তের বিদ্যুৎ লিমিটেড থেকে রেডিওর বাক্সে চোরাই বিলাতী মদ চালান যায় এটা প্রকাশ পেলে অপদস্থ হতে হবে তো তাকে। কিছু কি করা যায় না? সামলানো যায় না আগেই? এত গণ্য-মান্য ক্ষমতাবান লোকের সঙ্গে তার খাতির, আগে থেকে চাপা দিয়ে দেওয়া যায় না ব্যাপারটা?

দাশগুপ্ত ডাকে, চন্দর।

চন্দ্র ওপরে বাবু।

ডেকে দে। শীগ্‌গির।

দাশগুপ্তের পরম বিশ্বাসী ধূর্ত্তশ্রেষ্ঠ চন্দ্র এসে দাঁড়ায়। মাঝ-বয়সী ঈষৎ স্থূলকায় মানুষটা, মুখখানা গোলাকার। আই-এ পর্য্যন্ত পড়েছিল, বুদ্ধিটা তাতে শাণিত হয়েছে। তিনতলা এক রকম সেই চালায়, বড়লোক, মাঝারি লোক সবাইকে খুসী রাখে এবং যার কাছে যত বেশী সম্ভব খসিয়ে নেয়। হিসাব রাখে, অন্য চাকরদের হুকুম দেয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের যে মেয়েরা শিকার খুঁজতে আসে, তাদের প্রয়োজন মত সবিনয়ে ও সসম্মানে অলঙ্ঘনীয় নির্দ্দেশ দেয়, আবার দরকার হলে প্যাট্রনের সোডার বোতল নিজ হাতে খুলে দেওয়া থেকে পা-ও চাটে।

দাশগুপ্ত কিছু বলার আগেই সে সুরু করে নিরুত্তেজ কণ্ঠে, গণেশ ফেরেনি বাবু? ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। মাল শুধু পৌঁছে দেবে, ওর হাতে টাকা দেবার তো কথা নয়। টাকা হাতে পেয়ে লোভের বশে পালাতো সে বরং সম্ভব ছিল, মাল নিয়ে পালাবার ছোকরা তো ও নয়!

চন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করবে? মনে মনে কথাটা নাড়া-চাড়া করে দাশগুপ্ত। চন্দ্র তার মস্ত সহায়, মানুষ চিনতে ও ওস্তাদ, এমন কি গণেশের মত তুচ্ছ লোককে যে শুধু একতলায় দোকানের কাজে রাখতে হবে, তেতালার ব্যাপার টের পেতে দেওয়া চলবে না, এ পরামর্শও সেই দিয়েছিল। সে নিজে অতটা গুরুত্ব দেয়নি, বরং ভেবেছিল এ ধরণের গেঁয়ো বোকা

ছোকরাকেই তেতলার কাজে লাগানো নিরাপদ্। দরকারের সময় তেতলার খুঁটি-নাটি কাজ সে গণেশকে দিয়ে করিয়েও নিয়েছে কয়েক বার। ম্যাকারণ টেলিফোনে যা বলেছে তাতে বোঝা যায় মরবার আগে গণেশ কিছু বলে যেতে পারেনি, তা হলে তার নাম-ঠিকানা-পরিচয় জানবার জন্য ম্যাকারণের কাছে খোঁজ নেওয়া হয়ত না। কিন্তু গুলি লেগে যদি এ ভাবে মরে না যেত গণেশ, সজ্ঞানে যদি সব কথা বলে যেতে পারত, হয়তো তেতলার ব্যাপারও তা হলে ফাঁস করে দিয়ে যেত। ভাবলেও শিউরে ওঠে দাশগুপ্ত।

গণেশের খবর পেয়েছি চন্দর। একটা মুস্কিল হয়েছে। কে কে এসেছে আজ?

অনেকে আসেনি। হাঙ্গামাটা হল। দত্ত সায়েব, বিনয় বাবু, পিটার সায়েব, রায় বাবু, ঘোষ সায়েব—

ঘোষ সায়েব এসেছেন?

হ্যাঁ। ছোট একটা মেয়েকে এনেছেন, পনের হবে কি না। এক চুমুক খেয়ে বমি করে দিল। চন্দ্রর মুখে অদ্ভুত একপেশে হাসি ফোটে, গণেশের ব্যাপারটা কি বাবু?

বোকা পাঁঠা তো, হাঙ্গামার মধ্যে গিয়েছিল। গুলি খেয়ে মরেছে। এখন মালটা শুদ্ধ হাসপাতালে আছে। নাম-ঠিকানা খুঁজছে, ম্যাকারণকে ফোন করেছিল। গণেশ দু'বার গেছে

ম্যাকারণের বাড়ী, শ্লিপে ঠিকানা লিখে দেবার কি দরকার ছিল ? সুধীর একটা গাধা।

চন্দ্র প্রায় নির্ব্বিকারভাবেই সব জেনে নেয় এবং মেনে নেয়।

কি করবেন ঠিক করলেন বাবু ?

ঘোষকে বলব ভাবছি। ঘোষ চেষ্টা করলে মালটা সরিয়ে ফেলে সামলে নিতে পারবে।

চন্দ্রকে চিন্তিত দেখায়।

তা নয় পারবেন, আজও কিন্তু উনি সেবারেরটা ভাঙ্গিয়ে চালাচেছন! এমন তুখোড় লোক আর দেখিনি। সামান্য ব্যাপার, কি আর করতে হয়েছিল ওনার! তাই টানছেন আজ পর্য্যন্ত। মদের দামটা পর্য্যন্ত আদায় করা যায় না। ফের ওঁকে কিছু করতে বললে পেয়ে বসবেন একেবারে।

মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে সায় দেয় দাশগুপ্ত, জ্বালার সঙ্গে বলে, কি করা যায় বলো, এ সব লোকের কত ক্ষমতা, এদের হাতে না রাখলে কি ব্যবসা চলে। ঘোষের মত বেহায়া আর কেউ নেই। আর সকলে কাজ করে দেয় সে জন্য টাকা নেয়, কিন্তু এখানে যা খরচা করে তা দেয়। ঘোষের সেটুকু চামড়াও নেই চোখে। ব্যাটা পেয়ে বসবে, কিন্তু বুঝতে পারছো তো, ওরা খোলবার আগে মালটা সরিয়ে আনা চাই। এমনি কোন ভাবনা ছিল না। ছোঁড়া গুলি খেয়ে মরল কিনা, মুস্কিল সেখানে।

চন্দ্রর মনটা তবু খুঁত-খুঁত করে। ঘোষ সায়েব যে শুধু তেতলার ভোগ সুখ আরাম বিরামের জন্য খরচা পর্য্যন্ত দেয় না তা নয়, চন্দ্রর ব্যক্তিগত পাওনাও তার কাছ্ থেকে জোটে যৎসামান্য, একটা সাধারণ বয়-এর বকশিসের মত। এটা যেন তারই বাড়ী, সবাই তার মাইনে-করা চাকর, এমনি ব্যবহার করে ঘোষ সায়েব।

এক কাজ করলে' হয় না?

বলো কি করব! দাশগুপ্ত খুশী হয়, দেখি আমাদের চন্দরের বুদ্ধির দৌড়।

আপনি নিজে গিয়ে যদি গণশাকে চিনে দেন আর মালটা দাবী করে নিয়ে আসেন? মালটা সরিয়ে আনার পর ওতে কি ছিল কে জানবে, আপনি যা বলবেন তাই।

দাশগুপ্ত সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে যায়, মনে মনে তারিফ করে চন্দ্রের বুদ্ধির। নিজেকে কূটবুদ্ধি খাটাতে হয় দিবারাত্রি, জীবনে একমাত্র অবলম্বন এই বুদ্ধি খাটিয়ে সাফল্য লাভের মাদক গর্ব্ব, অন্যের কাছে সামান্য একটু ধূর্ত্ততার পরিচয় পেলেই তাই আশ্চর্য্য মনে হয় দাশগুপ্তের।

আমিও তা ভেবেছি চন্দর। ওই যে বললাম, খুনের ব্যাপার, মালের গায়ে কোন ছাপ নেই। দাবী করলেই কি ছাড়বে? চেনা অফিসার কেউ থাকলে বরং—

পিটার সায়েবের একখানা চিঠি নিয়ে যান না?

ওকে জানাতে চাই না। হাজার টাকা চেয়ে বসবে।

জানাবেন কেন। মাল আপনাকে দিয়ে দেবার জন্য চিঠি তো চাইবেন না। কি দরকার? শুধু আপনি অমুক লোক, আপনাকে ও চেনে এই বলে একটা চিঠি দেবে। বাস্। বলবেন, যদি দরকার লাগে তাই দু'লাইন সার্টিফিকেটটা রাখছেন। এক বোতল স্কচ দিলেই খুসী হয়ে লিখে দেবে।

চন্দ্রের বুদ্ধিতে এবার এত বেশী আশ্চর্য্য হয়ে যায় দাশগুপ্ত যে, ঈর্ষায় জ্বলে যায় তার বুকটা। সত্যই যায়। চন্দ্র তার চাকর, সে তাকে বাবু বলে, তবু। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তার মনে হয়, আসলে চন্দ্রই চালাচ্ছে তার সমস্ত কারবার নিজে আড়ালে থেকে তাকে সামনে খাড়া করে রেখে, চন্দ্র তার চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। আয়ের মোটা ভাগটাই তার বটে, কিন্তু সেটাও এক হিসাবে চন্দ্রের বুদ্ধিরই পরিচয়। তার যেমন আয় বেশী তেমনি সমস্ত দায়িত্ব তার ঘাড়ে, সমস্ত বিপদ তার, নিজেকে সব দিক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে চন্দ্র তো কম রোজগার করছে না। যুদ্ধের আগে তার ও চন্দ্রের অবস্থা যা ছিল তার সঙ্গে তুলনা করে হিসাব ধরলে তার চেয়ে চন্দ্রের সাফল্য আর উন্নতি কি শতগুণ বেশী হবে না? তার মত একজনকে অবলম্বন না করে চন্দ্রের পক্ষে এত বড় স্কেলে কারবার চালানো সম্ভবও ছিল না। সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিত ফ্যাশন-কায়দা-দুরস্ত মোটামুটি অবস্থাপন্ন বড় বড় লোকের সঙ্গে অন্ততঃ পক্ষে মৌখিক পরিচয়-

যুক্ত তার মত এক জনকে না পেলে এত কাণ্ড করতে পারত না চন্দ্র। তার মোটা টাকা, তার মোটা প্রতিপত্তি, তার মোটা দায়িত্ব,—তাকে মোটা আয় দিয়ে নিজের স্বপ্ন সফল করতে আপত্তি হবে কেন চন্দ্রের। তার স্বপ্ন সফল হয়নি। অনেক সে পেয়েছে কিন্তু দু'হাতে দিতেও হয়েছে অনেক। চন্দ্র যে এত টাকা মারছে, তার দশ হাজার উপার্জন হলে চন্দ্রের যেখানে দশ টাকা হওয়া উচিত সেখানে সে যে হাজার টাকা গাপ করছে, চোখ-কান বুজে তার সেটা সহ্য করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। চন্দ্রকে ছাড়া তার চলবে না, চন্দ্রই যেন সব চালাচ্ছে।

এ জ্বালা আগেও দাশগুপ্ত মাঝে মাঝে অনুভব করেছে, তবে এমন তীব্র ভাবে নয়। জীবনের একমাত্র বাহাদুরীর ফানুস কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ফেঁসে যাওয়া কয়েক মুহূর্ত্তের আত্মহত্যার চেয়ে কম যাতনাদায়ক নয়।

তারপর অবশ্য সামলে নেয় দাশগুপ্ত, পূরোপূরি। সস্তা মানুষ ফুঁ দিলেই কাঁপে। কত আর করেছে চন্দ্র? বিশ-পঁচিশ হাজার? তাই নিয়ে তার ক্ষোভ। এ যেন নায়েব-গোমস্তা দারোগার দুটো পয়সা হয়েছে দেখে রাজার হিংসা করা।

বাবু—

দাঁড়াও দাঁড়াও—। দাশগুপ্ত বলে সেনাপতির মত, ওসব ভেবেছি। তোমার কথায় আর একটা কথা মনে পড়ল। কি

জান, গণেশকে আমি আইডেন্‌টিফাই করতে চাইনা, যদি না করে চলে। এখন মনে পড়ল। হাসপাতালে হট্টগোল চলছে, সুযোগ বুঝে মালটা সরিয়ে আনা চলতে পারে। যদি ফ্যাকড়া বাঁধে, পিটারের চিঠি দেখালেই হবে। বললেই হবে ফ্রুট্‌স আছে, খারাপ হয়ে যাবে বলে সরিয়ে নিচ্ছি। তখন গণেশকে আইডেন্‌টিফাই করব। ফ্যাকড়া কিছু হবে না মনে হয়। দোকানের একটা চাকর, তার জন্য কে মাথা ঘামায়?

আপনার কি বুদ্ধি বাবু! চন্দ্র সবিনয়ে বলে।

শিয়ালদ'র কাছে বস্তির ঘরে ভোরে ঘুম ভাঙে ওসমানের। তার আগে অনেক কারা জেগেছে, কথা বলছে। অনেকের কথার সমগ্র আওয়াজটাই কানে লাগে প্রথম, চেতনায় সে আওয়াজ শব্দ হয়ে ওঠে গণেশের সেই কথা : ওরা এগোবে না ? শব্দিত চেতনা হয়েই যেন ছিল প্রশ্নটা তার মনেরও মধ্যে, জেগে উঠে মনে পড়ার বদলে যেন জাগরণটাই পরে এল।

শূন্য ঘরে ঘুম ভেঙে গণেশের ওই প্রশ্নটা মনের ধ্বনির মত শোনার সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে দেশের বাড়ীতে বৌ ছেলে মেয়ের ভাবনা, তারা কেমন আছে এই জিজ্ঞাসা।

- কাজে আজ সে যাবে না। যাওয়া উচিত হবে না। তারও নয়, কারও নয়। এক অফুরন্ত বিশ্বাস ও দৃঢ়তা অনুভব করে ওসমান, সবাই যখন এক হয়ে গেছে এগোবার প্রতিজ্ঞায়, নির্দ্দেশ দিতে হয়নি নেতাদের, এমন অকারণ অর্থহীন অত্যাচারের প্রতিবাদও সবাই করবে এক হয়ে, কাউকে বলে দিতে হবে না। এ সিদ্ধান্তের একটা অদ্ভুত সমর্থন অনুভব করে ওসমান, শুধু তার ভিতরের বিশ্বাসে নয়, বাইরে থেকেও যেন বহু লোকের সমর্থন সে স্পষ্ট টের পাচ্ছে। প্রথমে বুঝে উঠতে পারে না। ঘরের বাইরে গিয়ে বস্তির বহু কণ্ঠের কলরব কানে এলে তখন সে বুঝতে পারে। রাত্রি শেষেই বস্তি প্রায় খালি করে যারা কাজে চলে যায়, তারা এখনো কেউ যায়নি।

তার মানেই কাজে তারা আজ যাবে না, কাজে যেতে হলে ভোরের আলোয় বস্তিতে বসে উত্তেজিত আলোচনার বৈঠক বসানো চলে না। তার উঠতে দেরী হলে রহমান সিদ্দিক গোলামেরা কেউ বেরোবার সময় তাকে ডেকে দিয়ে যায়, আজ ভোর পর্য্যন্ত কেউ তাকে ডেকে তোলেনি কেন এতক্ষণে ওসমান বুঝতে পারে। নিজেরা যখন তারা কাজে যাবে না, ওসমানও অবশ্যই যাবে না, এটা তারা নিজেরাই ধরে নিয়েছে। সুতরাং কাজ কি অনর্থক ঘুমন্ত মানুষটাকে ডেকে তুলে।

তার কারখানার লোকেদের একতা গড়ে উঠতে উঠতে বার বার ভেঙ্গে যাচ্ছে নানা সয়তানী কারসাজিতে। ট্রামের কাজে ইস্তফা দিয়ে এখানে কাজ নিতে হওয়ায় মনে তার একটা অভাব বোধ জেগে ছিল। সব সময় মনের মধ্যে সে গভীর ঔৎসুক্য অনুভব করে ভেদহীন বৃহৎ এক সংগঠনের একজন হয়ে থাকতে। এই কারখানায় সে সাধটা তার যেন কিছুতেই মিটছে না।

এদিকে সেদিন ট্রামকর্ম্মীদের পরিপূর্ণ একতার পরম প্রমাণ দেখা গেল। সেই থেকে নিজেকে তার যেন বঞ্চিত মনে হয়েছে। অহরহ মনে হয়েছে ট্রামের কাজে থাকলে আজ তো সে নিজেকে ওদেরি এক জন ভাবতে পারত, চব্বিশ ঘণ্টা

আপনা থেকে অনুভব করত হাতে হাত মেলানো হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সে স্থান পেয়েছে। কালও এ অভাববোধ তাকে পীড়ন করেছে। কাল কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল সব। আজ সকালে বস্তিতে ঘুম ভেঙে উঠে শুধু যে সে অভাব-বোধ মিটে গেছে তা নয়, আশা পূর্ণ হয়েও অনেক বেশীই যেন সে পেয়েছে। ঘরের কোণে শুধু তার একার মনে সঙ্কল্প জেগেছিল, আজ সে কাজে যাবে না। ঘরের বাইরে এসে সে দেখেছে শুধু তার একার নয়, সকলের মনেই আপনা থেকে সেই সঙ্কল্প দেখা দিয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তবে আর হাজার হাজার কেন, সংখ্যাহীন কত মনের সঙ্গে তার মন হাত মিলিয়েছে কে বলতে পারে!

খলিল বলে, দাদা, কাণ্ড হল। ট্রাম বাস স-ব বন্ধ!

ওসমান সায় দেয়, তা হবে না? ও তো জানা কথা।

রেজ্জাক উত্তেজিত হয়ে বলে, রেলগাড়ী আটকে দিলে হয় না? লাইনের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ে? ইঞ্জিন খালি সিটি দিয়ে যাবে এক ধার থেকে এগোতে পারবে না?

ওসমান বলে, না না, রেলগাড়ী আটকানো ঠিক হবে না।

লাল ইঁটের লম্বা প্রাচীরের পাশে নোংরা ফাঁকা স্থানটিতে একে একে বহু লোক এসে জড়ো হয়। গায়ে মাথায় দু'ফোঁটা জল ঢেলে তার টিনের পাত্রটি ভরে একটু জল আনতে কলতলায় গিয়ে ধন্না দেবার জন্য গুটি গুটি চলতে চলতে বয়সের ভারে

বাঁকা নানীও খানিক দাঁড়িয়ে যায়। মেয়েরা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, খুঁটিনাটি আরও বিবরণ জানতে চায়, ঝাঁঝালো গলায় ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে। অদম্য ক্রোধ ও ক্ষোভের চাপে অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যের ছাপ পড়ে মুখগুলি যেন বদলে গিয়েছে মেয়ে-পুরুষের। প্রতিটি কথা, প্রতিটি ঢোঁক গেলা, প্রতিটি নিশ্বাস, প্রতিটি দৃষ্টিপাত শুধু প্রতিবাদ। কালকের ঘটনায় আছে যুগ-যুগান্তরের অমানুষিকতা, যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত ক্ষোভ তাদের করে দিয়েছে প্রতিবাদের বিস্ফোরণ। এতে আশ্চর্য্য কি যে, শান্ত শীতল শীতের সকালে কাপড়ের সামান্য আবরণে ঠাণ্ডায় কেঁপেও কেউ কেউ ভেতরের তাপে দাঁতে দাঁত ঘষবে।

তখন তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় হানিফ।

কথা বলে সে উত্তেজনাকর, মারাত্মক। ক্ষুব্ধ মানুষগুলিকে সে যেন ক্ষেপিয়ে দিতে চায়। বলতে বলতে নিজেও সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে ভয়ানক রকম।

চলো যাই সব। আজ হাঙ্গামা হবে ভীষণ। মোরা চুপ করে থাকব? চলো যাই সবাই মিলে। বহুত আদমি জড়ো হবে। দোকান-পাট ভেঙে সব চুরমার করে ফেলব। মোরা সুরু করে দিলে কাণ্ডটা যা বাধবে একচোট---

হানিফের সঙ্গে এসেছিল বুধুলাল, সে বলে ওঠে, সাবাস! সাবাস!

কয়েকটি অল্পবয়সী ছোকরা চঞ্চল হয়ে ওঠে কিন্তু অন্য সকলে আরও যেন শান্ত হয়ে গিয়েছে মনে হয়। এমন কি যারা দাঁতে দাঁত ঘষছিল তাদের চোয়াল ঢিল হয়ে যায়।

কি বলছ মিঞা? মাথা খারাপ না কি? ওসমান বলে।

হানিফ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, কেন?

আমরা গিয়ে দোকানপাট ভাঙব, গুণ্ডাদের লুট-পাটের সুবিধা হবে। ও কি একটা কথা হল? ওসমান জোর গলায় চেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলে, 'দোকান-পাট ভাঙার কথা ওঠে কিসে? সভা কর, মিছিল কর, হরতাল কর। দোকান বন্ধ থাক। ব্যস্।

গুণ্ডা বলছ কাকে? সামনে এগিয়ে রুখে ওঠে হানিফ। হানিফ বাড়াবাড়ি করলে তাকে রুখবার জন্য উপস্থিত কয়েক জন ওসমানের কাছে ঘেঁসে আসে।

কাকে বলব? সহরে গুণ্ডা নেই? আমরা দোকানে হানা দিলে তাদের মজা, এ তো জানা কথা।

বড় বাড় বেড়েছে তোমার। হানিফ শাসায়।

হাঙ্গামা কোরো না হানিফ।

সিদ্দিক বলে একপা আরও এগিয়ে হানিফের সামনে গিয়ে। আরও কয়েক জন ওসমানের কাছে ঘেঁষে আসে। সেদিকে চেয়ে একটু ইতস্ততঃ করে হানিফ চলে যায় সঙ্গী ক'জনকে নিয়ে। বুধুলাল দু'বার মুখ ফিরিয়ে ওসমানের

দিকে তাকিয়ে যায়। সে দৃষ্টির অর্থ খুব পরিষ্কার, আচ্ছা দেখে নেব। বুধুলাল এ অঞ্চলের বিখ্যাত গুণ্ডা নেতা। হানিফের চেয়েও তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বেশী।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ওসমান পথে বেরিয়ে পড়ে। গণেশের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে আর একটু বেলা করেই হাসপাতালে যাবে, এত সকালে গিয়ে কোন লাভ হবে না। আগে একবার রসুলের বাড়ী যাবে। রসুলের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্ত্তা বলার জন্য মনটা ছটফট করছিল ওসমানের। রসুল তার ছেলের মত, সাহসে তেজে বুদ্ধি-বিবেচনায় ভুল-ভ্রান্তি বোকামিতে, সব দিক দিয়ে টান একটা বরাবর ছিল রসুলের দিকে তার, কিন্তু আজকের মত সে টানে কখনো টান পড়েনি এত জোরে, আগে শুধু ছিল এই পর্য্যন্ত।

কত ভাবে মনটা আজ তার নাড়া খাচ্ছে, তবু তারি মধ্যে ভেসে ভেসে আসছে পারিবারিক একটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আবছা চিন্তা। পরীবাণু সেয়ানা হয়ে উঠেছে অনেক দিন, এবার তার সাদির ভাবনাটা রীতিমত গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাঁ থেকে প্রতি পত্রে তাগিদ আসছে পরীবাণুর মার। এদিক্-ওদিক্ ছেলে খুঁজছে ওসমান, আত্মীয়-বন্ধুর কাছ থেকে সন্ধানও আসছে মাঝে মাঝে। কিন্তু পছন্দ যেন তার হচ্ছে না এক জনকেও। হবু জামায়ের কতগুলি রকমারি বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি

যেন আগে থেকে মনের মধ্যে তৈরী হয়ে আছে, সেই মাপে খাপ খাচ্ছিল না এক জনও পুরোপুরি। যে ছেলে তার নেই, জামাই খুঁজছিল সে সেই ছেলের মত,---যত দূর সম্ভব সেই ছেলের মত। এ ধারণা তার কাছে পরিষ্কার নয়, মনের এই খামখেয়ালী আবদার। টের পেলে নিজেকে সে সংযত করে ফেলত সঙ্গে সঙ্গেই। আজও সে বুঝতে পারেনি কিসে কি ঘটেছে মনে। রসুলের সঙ্গে পরীবাণুর সাদি হলে তো মন্দ হয় না, এই কথাটা মনে পড়ছে ঘুরে-ফিরে মনের গভীর তলানো ইচ্ছার ভাসা-ভাসা ইঙ্গিতের মত।

রসুলের বাড়ী বেশী দূরে নয়। এইটুকু পথ যেতে অনেকটা সময় লাগে ওসমানের। ইতিমধ্যেই মানুষ জড়ো হতে আরম্ভ করে দিয়েছে রাস্তায়, বিক্ষোভ প্রকাশ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে মৃদুভাবে। সমবেত কোলাহলের বিশিষ্ট সুরটাই বিক্ষোভের। উৎসব-পার্ব্বণে আরও বড় জনতার কলরব ওসমান শুনেছে, তার সুর একেবারে অন্য রকম। কোন রকম গাড়ী-ঘোড়াই এক রকম চলছে না রাস্তায়। মোড়ে ওসমানের সামনে একটি মোটর গাড়ীকে আটকে জবরদস্তি ফিরিয়ে দেওয়া হল। পরক্ষণে আর একটি গাড়ীকে দাঁড় করানো হল, কিন্তু আরোহীর সঙ্গে দু'একটি কি কথা হবার পর সকলে সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিল, দু'জন যুবক দু'পাশে হেঁটে মোড়ের ভিড়টা পার করে এগিয়ে দিয়ে এল গাড়ীটাকে।

ডাক্তারের গাড়ী। এক জন বলল ওসমানের জিজ্ঞাসার জবাবে!

সহরের অন্যান্য যায়গাতেও কি এই রকম সুরু হয়ে গেছে?—ওসমান ভাবে। রাইফেলধারী পুলিশ-বোঝাই গাড়ী চলে যায়। ধ্বনি উঠে 'জয় হিন্দ!' 'ইনকুাব জিন্দাবাদ।' 'সাম্রাজ্য-বাদ ধ্বংস হোক।' ওসমান আবার ভাবে, কর্ত্তারা যদি ফের বোকামি করে, লাঠি আর বন্দুক দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করে এই রাগ-দুঃখের প্রকাশ, কি হবে তা হলে?

আমিনা নিজেই দরজা খুলে দেন। তাঁর রাতজাগা চোখ দেখেই ওসমান শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, রসুল—?

সে তো হাসপাতালে ফিরে গেছে? আসুন বসুন।

ওসমানকে মোড়া দিয়ে আমিনা নিজে রসুল যে টুলে বসে কেরাসিন কাঠের টেবিলে পড়া-শোনা করে সেটাতে বসেন। মোড়ার পাড়ের সুতোয় কাজ-করা কাপড়ের ঢাকনিটি ভারি সুন্দর।

ফিরে গেল কেন?

আমিনার মুখে রসুলের বাড়ী আসা ও হাসপাতালে ফিরে যাবার বিবরণ ও কারণ শুনে ওসমান খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

অনেক খুন বেরিয়ে গেছে!

সেটাই ভাবনা এখন। আমিনা ধীরে ধীরে বলেন।

ওসমান বলে, খুন না কি জমা থাকে বোতলে, গায়ে ঢুকিয়ে দেয়?

তাই দিত ওকে, ও নিজে নিতে চায়নি শুনলাম। বোতলের খুন কম ছিল, অনেকের দরকার ছিল জরুরী, তাইতে।

হাঁ।

আচমকা স্পষ্টতর প্রবলতর হয়ে রসুলকে জামাই করার সাধটা আছড়ে পড়ে ওসমানের মনে।---হাসপাতালে যাই একবার, দেখে আসি ওকে।

এখন ওসব কথা তোলার সময় নয়, আমিনা শুনে হয়তো কি ভাববেন, এ সব জেনেও ওসমান হৃদয়ের তাগিদটা রুখতে পারে না, বলে, এক আরজ আছে আপনার কাছে, জানিয়ে রাখি। মেয়েটা বড় হয়ে গেছে, পরীবাণু। ওকে তো দেখেছেন আপনি?

কতবার দেখেছি।

পরীবাণুর কথা কোথা আসে ভেবে আমিনা আশ্চর্য্য হয়ে যান।

ওর জন্য ছেলে খুঁজছি। তা আমার আরজ রইল আপনার কাছে, রসুল ফিরলে আমার মেয়েকে আপনার নিতে হবে। আমি মজুর বটে, লড়ি হাঁকাই, আমার মেয়ে নিলে ঠকবেন না।

এ তো খুশীর কথা! আমিনা বলেন আন্তরিকতার সঙ্গে তবে কি জানেন, রসুলের মত থাকা চাই।

তা চাই না? রসুলের মত চাই আগে।

আপনার সাথে হাসপাতালে যাব? আমিনা যেন নিছক প্রশ্ন করেন তার ব্যাকুল আগ্রহ চেপে রেখে।

যাবেন? ওসমান চিন্তিত ভাবে বলে, হেঁটে যেতে হবে। রাস্তায় হাঙ্গামা চলছে। পরে নয় যাবেন। সেই ভাল। আমি দেখে আসি, ঘরে ফিরবার আগে আপনাকে জানিয়ে যাব কেমন আছে।

সেই ভাল তবে!

আমিনা জানেন ওসমানের ছেলে-হারানোর ইতিহাস, তারই রসুলের মত যোয়ান ছেলে। দেশ-সেবার পথ নিয়ে কাদেরের সঙ্গে তার মতান্তর ছিল বরাবর। বড় তেজী ছিল ছেলেটা। মানত যা, করত তাই। খান বাহাদুরের শেষ বারের নির্দ্দেশ মানতে তার নাকি দ্বিধা হয়েছিল, ওসমান নিজেই বলেছে আমিনাকে। তারপর হাসপাতালে মরবার তিন দিন আগে বাপের কাছে সে মাপ চেয়েছিল, বলেছিল, এস, ডি, ওর গাড়ীতে চেপে আমাদের ফেলে খান বাহাদুর পালালেন, গাড়ীর পেছনের চাকা আমার ডান পাটা পিষে দিয়ে গেল, সে জন্য দোষ দিই না। প্রজাদের মারতে আমাদের পাঠিয়েছিলেন তা কি জানতাম? আজ এসে প্রজাদের ক'জনের নাম করে বললেন কি, ওরা আমাদের মেরেছে বলতে হবে! তখন বুঝলাম ব্যাপারটা। প্রজারা কেউ আমাদের মারেনি। যাদের নাম করলেন, আমি

জানি তারা ভিন্ গাঁয়ে কিষাণ-সভা করছিলেন। তোমার কথাই ঠিক হল। এবার বেরিয়ে তোমার কথা, জিয়াউদ্দীন সাহেবের কথা শুনব, নিজে তলিয়ে বুঝব, তবে কিছু করব। মরবার তিন দিন আগে যে ভাষায় যে ভাবে কথাগুলি সে বলেছিল, ওসমানের মুখে শুনে, হয়তো ছেলেহারা ওসমানের মুখে শোনার জন্যই, মনে আমিনার গাঁথা হয়ে আছে মুখস্থ করা ইস্তাহারের মত। ছেলে বাঁচবে এটাই জানা ছিল ওসমানের। ছেলে মরবে, তিন দিনের মধ্যে মরবে, জানা ছিল না তার। সমবেদনায় বুক ভরে গিয়ে আমিনার চোখের জল উপচে পড়তে চায়।

তারা কথা বলছে, ওসমান উঠি উঠি করছে, রসুলের খবর জানাতে সীতা আসে। সমস্ত রাস্তা সীতা ভাবতে ভাবতে এসেছে ঠিক কি ভাবে মার কাছে হাসপাতালে ছেলের অবস্থার কথা বলে মার মনে ছেলের সম্বন্ধে কতখানি আশা আর কতটুকু ভয় জাগানো চলে, যা সঠিক। রসুল মোটামুটি ভাল আছে, এবং ভাল সে দু'চার দিনের মধ্যে হয়ে উঠবে, এটাই হল প্রধান কথা। কিন্তু ভয়েরও কারণ একটু আছে সামান্য, কিন্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার মত নয়। আমিনাকে তা জানানো দরকার। তার কাছে অনায়াসে গোপন করে যাওয়ার মত তুচ্ছ নয় আশঙ্কাটা। আমিনাকে আজ ভয়ের কিছুই নেই জানিয়ে যাবার পর আবার কাল যদি চরম দুঃসংবাদটা তাকে জানাতে হয়, সেটা তার সঙ্গে বীভৎস শত্রুতাই করা হবে শুধু।

পথে মনে মনে কথা সাজিয়েছিল সীতা, এখানে এসেই সেগুলি সে ছেঁটে ফেলে। সহজ সরল ভাবে কথা বলাই সে মনে করে উচিত।

রসুলের খবরটা জানাতে এলাম। রসুল ভাল আছে, ঘুমোচ্ছে।

তবে---?

ভয় পাবেন না। অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে, তার ওপর রাত্রে আবার বাড়ী এসে ফিরে যাবার হাঙ্গামা করায় খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। ওকে রক্ত দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এতক্ষণে বোধ হয় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। অল্প সময়ে সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে জানেন তো, খুব দুর্ব্বল অবস্থায় একটু ভয় থাকেই।

ও। দু'জনে একসঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সীতাকে চমকে দিয়ে বলে, ভয় তো আছেই।

সীতা নিজেও স্বস্তি বোধ করে বলে, তাই বলছিলাম। শুধু দুর্ব্বল তো রক্তক্ষয়ের জন্য, রক্ত দিলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। শক্-এর ভয়টুকু আছে। সেটা সব ক্ষেত্রেই থাকে, সাধারণ অপারেশন, ডেলিভারি---

সীতা যেন লজ্জা পেয়েই থমকে থেমে যায় আমিনার দিকে চেয়ে।

আমিনা সায় দিয়ে বলেন, তা ঠিক। বরো ন'বছর পরের এ জঞ্জালটা দু'তিন মাস পরে বিয়োতে হবে, মরেই যাব হয়তো!

দু'মাস আগে জেলে গেলেন, তিনখানা চিঠি পেয়েছি আজতক তার। প্রতি চিঠিতে শুধু জিজ্ঞেস করছেন, আমার কি হল, আমি কেমন আছি, কি হল যেন চটপট জানাই, কারণ এই ভয়ে উনি মরছেন। জানো মেয়ে, ছেলের চেয়ে আমার জন্য তার ভয় বেশী। ছেলের যা মতামত জানতেন, তাতে কেউ খুন না করলে ছেলের কিছু হবে না ধরাই ছিল। তাছাড়া, উনি ভাবতেন, ছেলের বয়স হয়েছে, ছেলে মরদ। মরদ যদি মরদের মত মরে---

এর ওর কাছে রসুলের মার কথা সীতা শুনেছিল, এমনটি ভাবতে পারেনি। রসুলকে বাদ দিলে এই অবস্থায় এখন তাঁর দশ বছরের একটি ছেলে মাত্র সম্বল! রসুলের জেল হলে কি করবেন সে কথাটা কি ভাবছেন না উনি? ভাবছেন নিশ্চয়। ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন এ আত্মবিশ্বাস আছে। যা হবার হবে ভেবে হাল ছেড়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার মানুষ তো ওকে মনে হয় না।

সীতা একটা খাপছাড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসে হঠাৎ---আগে আপনার পর্দ্দা ছিল?

ছিল না? আমিনা বলেন জোর দিয়ে, বাঙ্গালী মেয়ের পর্দ্দা আজও ঘোচে নি---তার আর আগে ছিল কি বলো?

ওসমান সায় দেয়, তা ঠিক।

হাসপাতালে বিশেষ করে ওসমানের জন্যই যেন চমকপ্রদ এক ধাঁধাঁ তৈরী হয়েছিল।

মাল? মাল ছিল নাকি ওর সঙ্গে?

ছিল না? ওর সঙ্গে যে এল প্যাক করা মালটা?

দাঁড়াও, দেখি খোঁজ করে।

আধ ঘণ্টা পরে---!

কই, মাল তো নেই। কিসের মাল? কি ছিল?

তখনো ধাঁধাঁ লাগে না ওসমানের। জিনিষটা অবশ্যই সরিয়ে রাখা হয়েছে নিরাপদ যায়গায়, যেখানে সেখানে তো ফেলে রাখা যায় না!

কি ছিল কে জানে, প্যাক করা বাক্সের মত। কাল টেলিফোন করা হল যদি খোঁজ মেলে কার কাছে মালটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কাল রাতে কিছু জানা যায়নি। কথা ছিল, আজ মালটা খুলে দেখা হবে ভেতরে নাম-ঠিকানার কোন হদিস মেলে কি না। কোথাও সরিয়ে রাখা হয়েছে হয়তো---

না, না। ওর সঙ্গে মাল ছিল না। সকালে লিষ্ট করা হয়েছে। এই তো নাম---গণেশ। বয়সে একুশ বাইশ---

নাম-পরিচয় জানা গেছে? ওসমান সাগ্রহে জিজ্ঞাস করে।

শুধু নামটা---গণেশ। হাতে উল্কি দিয়ে লেখা ছিল। মালের কথা কিছু নেই।

কি হল মালটা?

ছিলই না মাল, কি হল মালটা ! মানে ? তোমার নাম কি ? ওসমান ? ওর নাম তো গণেশ। তোমার এত মাথা ঘামানো কেন ওর জন্য ?

ওসমান একটু চুপ করে থাকে।

কি জানি, মাথাটা নিজে থেকে ঘামে।

ভদ্রলোকের মনে অপমানিত বোধ করার ভ্রুকুটি ফুটে উঠতে দেখে ওসমান যেন খুসীই হয় একটু।

সকালে হেমন্ত জামা গায়ে দিচ্ছে বেরোবার জন্য, অনুরূপা সামনে এলেন মুখ ভার করে।

এত সকাল বেরোচ্ছিস যে ?

সীতার কাছে যাব একবার।

অনুরূপার মুখ আর একটু লম্বা হয়ে যায়।

চা খাবি না ?

সীতার ওখানে খাব।

এসব তোরা কি আরম্ভ করেছিস্ হেমা ? অনুরূপা বলেন দুরন্ত দুঃখের ভাষায়, খোকা কখন্ কোথায় চলে গেছে আমাকে কিছু না বলে। তুইও বেরিয়ে যাচ্ছিস। বলে কি যেতে নেই একবার আমাকে ? এতই তুচ্ছ হয়ে গেছি আমি ?

বেরিয়ে তো যাইনি মা এখনো ? বলেই যেতাম তোমাকে।

ভুল-ঘরে লাগানো জামার বোতামটা খুলতে খুলতে হেমন্ত বলে অনুযোগের সুরে। সকালে আবার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল মার মনে কে জানে! এত সকালেই সংযম হারিয়ে অনুরূপা মান-অভিমানের পালা গাইতে সুরু করলেন হেমন্তের বিশ্বাস হতে চায় না। এমন গোজাসুজি জ্বালা বা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করাও তো মার স্বভাব নয়!

আবার বলে হেমন্ত সহজ সুরে, সকালে বেরোব, তোমায় তো বলাই আছে। একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, সীতা হয়তো বেরিয়ে যাবে। তাই ভাবলাম, ওখানেই চা খেয়ে নেবো। চায়ের জল চাপিয়েছ না কি? তাহলে খেয়েই যাই।

একা আমি কত দিক্ সামলাবো হেমা? কতকাল সামলাবো? হেমন্তের কথা যেন কানেও যায়নি এমনিভাবে অনুরূপা বলেন, রোজগার করে সংসারও চালাব, তোমাদের কার মাথায় হরদম কি পাগলামি চাপবে তাও খেয়াল রাখবো, অত আমি পারব না হেমা। এই তোমাকে আমি বলে রাখলাম। বড় হয়েছো, ভাইটার দিকে একটু তাকাতে পারো না? না বলে কোন ফাঁকে খোকা কোথায় চলে গেছে। কিছু খায়নি পর্য্যন্ত। খুঁজে ডেকে এনে শাসন করাতে পার না একটু ওকে?

কোথায় গেছে, এখুনি আসবে। এতে আবার শাসন কিসের?

তুই কিছু বুঝিস না হেমা। এমনি না বলে একটু এদিক ওদিক যায়, সে আলাদা কথা। ছোট ছেলে অমন করেই। কাল হৈ-চৈ করতে যেতে চাইছিল, আমি যেতে দিইনি। সকাল হতে না হতে তাই ইচ্ছে করে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি পালিয়েছে।

বেশী আটকালে এ রকম হয়। পাড়ার সব ছেলে রাস্তায় বেরিয়েছে, খোকা বন্দী হয়ে থাকবে?

বলে যেতে পারত।

কেন বলেনি জানো? যদি মানা কর এই ভয়ে। তা হলে তো তুমি আরও বেশী রাগ করতে, মানা করলাম, তবু চলে গেল। তোমার মনে কষ্ট দিতে চায়নি খোকা, বুঝতে পারছ না? আমারও তো ভয় হচ্ছিল কাল, তুমি যদি বারণ কর, কি করে তোমার মনে কষ্ট দেব।

বুঝেছি। কোন কথা শুনবে না ঠিক করাই থাকে তোমাদের, আমার সঙ্গে শুধু একটু ভদ্রতা কর।

যার সঙ্গে অভদ্রতা করতে হয় না কি?

হেমন্ত হাসে। অনুরূপাও এতক্ষণে খানিকটা শান্ত হয়েছেন মনে হয়।

থাকগে, যা খুসী কর। আমি তো এবার পেন্সন নেব সংসার থেকে। তোমাদের ঘাড়েই চাপবে ভাই-বোনের ভার।

তোমাদের? তোমাদের কে কে মা? ও। আমি আর তোমার ছেলের বৌ। তুমি এত হিসেব জানো মা?

কত দিন এ ভাবে এড়িয়ে যাওয়া চলবে, ঠেকিয়ে রাখা যাবে? হেমন্ত ভাবে পথে নেমে। এই তো সবে সূচনা, শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গড়াবে এই মায়ার লড়াই কে জানে। অথবা ক্রমে ক্রমে ঠিক হয়ে যাবে সব, সময় পেলে সম্ভব হবে মানিয়ে নেওয়া, শান্তি পাওয়া মার পক্ষে—তার পক্ষেও? বুঝে উঠতে পারে না হেমন্ত। পরিবেশ গড়ে মানুষকে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলাই সহজ মানুষের পক্ষে, অতি দরকারী লড়াইও এড়িয়ে চলতে মানুষ তাই এত ব্যাকুল, পলাতক মনোভাব তাই এত প্রবল। পালিয়ে পালিয়ে এড়িয়ে চলার দিন তার পক্ষে ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কি করতে হবে তাকে আগামী দিনগুলিতে, ঠিকমত তার জানা নেই। বিশেষ অবস্থায় আজকের দু'চার দশ দিনের বিশেষ কর্তব্য হয়তো তার জানা আছে, কিন্তু তারপর যখন দৈনন্দিন জীবনকে গড়তে হবে নতুন করে তার নিজের, মার, রমা ও খোকনের, চেনা ও অচেনা সব মানুষের জীবন গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, খাপ খাইয়ে, সম্মুখের দিকে গতি বজায় রেখে, শত শত গ্রহণ বর্জন নিয়ন্ত্রণ পরিমার্জনের মধ্যে ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা, হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ মান-অভিমানের খেলা ও লড়াই-এ, বাঁচা ও বাঁচানোর সংগ্রামে, তখন কি ভাবে

কি করবে ভেবেও পাচ্ছে না সে। আজ অবশ্য ভাবার সময় নয় ও সব---

কেন নয়? সীতা আশ্চর্য্য হয়ে যায় তার কথা শুনে, ভাববার যা আজ থেকে তা ভাবতে সুরু করলে দোষটা কি? ওই ভাবনায় মশগুল হয়ে তুমি তো আর সব ভুলে যাচ্ছ না? এক দিনে সব ভাবনা শেষ করে দেবার জন্য পাগল হয়ে উঠছ না? সেটা তাহলে ভাবা হবে না, কাব্য হবে। এক দিনে মানুষ বদলায় না। হঠাৎ বিবাগী হয়ে যে ঘর ছাড়ে, তারও ওই ঘর ছাড়াটাই ঘটে হঠাৎ, বৈরাগ্যটা নয়। আর তুমি তো সংসারে থেকে কাজ করবে। ভাবো, মাথা গুলিয়ে ফেলো না। এক দিনে সব ভাবনা মিটিয়ে দিতে চেয়ো না। রোজকার ভাবনা রোজ ভাবলে, রোজকার কাজ রোজ করলে, দেখবে সব ঠিক ঠিক হয়ে যাচ্ছে।

অর্থাৎ ধীর স্থির শান্ত ভাবে---

নিশ্চয়। ওটা দরকার। বিশেষ করে তোমার পক্ষে। মনকে একটু বশে না আনলে কেউ ভাবতে পারে না, সে এলোমেলো ভাবনার শেষ আছে? রাগ কোরো না, নিজেকে তুমি একা বলে জানো। তুমি ভাবতে শেখোনি সংসারে আরও দশ জন আছে, আরও দশ জনে ভাবে, আরও দশ জনে কাজ করে। নিজেকে দশ জনের এক জন বলে জানলে, দশ জনের সঙ্গে ভাবতে আর কাজ করতে শিখলে, তোমার ভাবনা চিন্তার

আসল গোলমালটা কেটে যাবে। ওটা হঠাৎ হয় না। মানুষ এক দিনে বদলায় না হেমন্ত।

কিন্তু মার কি হবে?

সব ঠিক হয়ে যাবে। কেন ভাবছ? সৃষ্টিছাড়া উদ্ভট কিছু তুমি হতেও যাচ্ছ না, করতেও যাচ্ছ না। যদিও তোমার হয়তো ওই রকম কিছু মনে হচ্ছে। তোমার যেমন নাট্যবোধ, জীবন-নাট্য তেমন নয় হেমন্ত। সীতা একটু থেমে বলে, উপদেশের মত লাগছে?

হেমন্ত সায় দিয়ে বলে, তা লাগছে কিন্তু শুনতে ভাল লাগছে।

কথাগুলি কিন্তু আমার উপদেশ নয় হেমন্ত। সীতা জোর দিয়ে বলে, তোমারও কিছু দিন আগে থেকে আমার বেলা যা ঘটতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেই অভিজ্ঞতার কথা বলছি। এ শুধু পরামর্শ। আস্তে আস্তে আজ কাল কি বুঝতে পারছি জানো? দেশ কাকে বলে তাই আমি জানতাম না দু'বছর আগে, এই ভীষণ সত্যটা। অথচ কি প্রচণ্ড অহঙ্কার ছিল দেশকে ভালবাসি বলে!

চায়ের কাপ মুখে তুলে চুমুক দিতে গিয়া হেমন্ত চেয়ে থাকে সীতার মুখের দিকে। নিজের ভুল আবিষ্কার করতে পারার জন্য সীতা কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ। যে বিশ্বাস মুখে এমন দীপ্তি, চোখে

এমন উজ্জ্বল স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি এনে দিতে পারে, সরল ও নম্রও বুঝি মানুষ হয় সেই বিশ্বাসের জোরেই। সীতাকে নিয়ে বহু দিনের বহু ঈর্ষা ক্ষোভ হতাশার অভিজ্ঞতা তো মুছে যায়নি হেমন্তের হৃদয় থেকে আজ এখানে আসবার সময়েও, এত ঘনিষ্ঠ হয়েও সীতাকে ভাল করে চিনতে না পারার জ্বালাটাই বুঝি তার ছিল বেশী—সীতাই যেন নানা কলা কৌশলে ওই দুর্বোধ্যতার ব্যবধান সৃষ্টি করে নিজেকে তার নাগালের বাইরে রেখে দিয়েছিল, দূরে যে সরিয়ে রাখা হয়েছে এটুকু জানতে বুঝতে দেবার দয়াটুকুও দেখায়নি। হৃদয়ে অনেক কাঁটার অনেক ক্ষতে আজ যেন প্রলেপ পড়ে হেমন্তর। নিজেকে তার ছোট ভাবতে হয়, কিন্তু সেজন্য তার খুব বেশী দুঃখ বা ক্ষোভ হয় না। বরং তৃপ্তির সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই সে এ জ্ঞানকে মেনে নেয় যে, নিজের ছোটমি দিয়েই সে পার্থক্য রচনা করেছিল তাদের মধ্যে, সীতা তাকে ঠেকিয়ে রাখেনি। কৃত্রিম আকর্ষণও সীতা সৃষ্টি করেনি তার জন্য, কৃত্রিম রহস্যের আবরণেও নিজেকে ঘিরে রাখেনি। সেই তার ছোট মাপকাটিতে সীতাকে মাপতে গিয়ে, তার গরীবের মূল্য বিচার দিয়ে দাম ঠিক করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, দুঃখ পেয়েছে। সীতার যে একটা সহজ স্বাভাবিক সরলতার গুণ আছে, তার পুরো দাম দিতে পর্যন্ত সে তো কোন দিন রাজী হয়নি। সীতার যা আছে সে তা মেনে নিতে পারেনি, কেটে-ছেঁটে কমিয়ে নিয়েছে নিজের প্রয়োজনে, তার

'নিজের অল্পতার সঙ্গে, দৈন্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে। যতই হোক, সীতা তো মেয়ে।

কি ভাবছো? চা-টা খেয়ে নাও। একটু ইতস্তত করে সীতা, যেচে সহজ সরল হতে গিয়ে সেটা অনর্থক হলে বড় বিশ্রী লাগে। নিজের চা সে শেষ করে। ভূমিকা যা করবে ভেবেছিল সেটা বাদ দিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে, মাসীমা কি ভাবে নিলেন?

কাল রাত্রে ভাল ভাবেই নিয়েছিলেন। সকালে যেন কেমন দেখলাম। মার মনে একটা খটকা লেগেছে—খটকা কেন বলি, মার খুব হিংসা হয়েছে।

জানি। সীতা চোখ তোলে, কাল তোমায় খুঁজতে এসে-ছিলেন, বলেই ফেলেছেন আমার কাছে। তোমায় নাকি পুতুল করে ফেলেছি আমি, খুসীমত নাচাচ্ছি। একেবারে বিশ্বাস জন্মে গেছে।

হেমন্তের কথায় নিরুপায়ের আপশোষ ফুটে ওঠে, আমরা কি করব। কাল রাত্রে মার সঙ্গে কথা কয়ে কত খুসী হয়ে-ছিলাম। সকালে পাঁচ মিনিটে মনটা বিগড়ে দিলেন। ঠিক কথাই বলেছ তুমি, মানুষ এক দিনে বদলায় না।

না হেমন্ত, সীতা মাথা নাড়ে, আমরা কি করব বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। মাসীমাকে সময় দিতে হবে।

মানে?

মানে মাসীমাকে বুঝে উঠতে, সয়ে নিতে সময় দিতে হবে। কাল আমিও চটে গিয়েছিলাম মনে মনে, ছেলে-মেয়েদের পঙ্গু করে রাখতে চায় এ কেমন অন্ধ স্নেহ! কিন্তু চটলেও মনটা খচখচ করছিল, কি যেন ভুল হচ্ছে। ভেবে দেখলাম, মাসীমার স্নেহ অন্ধ হোক, মোহগ্রস্ত হোক, তুমি তা উড়িয়ে দিতে পার না হেমন্ত! আমিও পারি না। অবশ্য বিশেষ অবস্থায় বড় দরকারে এসব স্নেহমমতার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না আমাদের। সে আলাদা কথা। সে কারণ ভিন্ন। বড় ব্যাপারে ঘরোয়া লাভক্ষতির হিসাব বাদ দিতেই হয়। কিন্তু এখানে তো কথাটা ঠিক তা নয়। তোমার আমার বন্ধুত্ব নিয়ে যত গণ্ডগোল। কাজেই, মাসীমা অন্যায় করলেও তাঁর স্নেহকে অবজ্ঞা করা যায় না, তাঁকে শাস্তি দেওয়া যায় না। বিশেষ করে আমরা যখন জানি, মাসীমাকে একটু প্রশ্রয় দিলে, একটু সময় দিলে উনি সামলে উঠতে পারবেন। মাসীমা স্বার্থপর নন, তোমাদের নিয়েই ওঁর স্বার্থ। আমাকে নিয়ে ওঁর হয়েছে মুস্কিল। এটা ওঁর দুর্ব্বলতা, অন্যায়, তা বলব। কিন্তু দুর্ব্বলতাটা জয় করার সময় আর সুযোগ ওঁকে না দিলে সেটা আমাদের অন্যায় হবে। তোমাকে তাই একটা কথা বলতে চাই।

বলো।

কিছু দিন তুমি আমার সঙ্গে মেলামেশা একেবারে কমিয়ে দাও।

কত দিন?

তোমায় আমি কেড়ে নিয়ে বশ করেছি এ ধারণাটা মাসীমার যদ্দিন না কাটে। শুধু মেলা-মেশা কমানো নয়, তোমার চাল-চলন থেকে মাসীমা যেন আবার ধারণা না করে বসেন, মিশতে না পেয়ে আমার জন্য তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এটাও তোমার খেয়াল রাখতে হবে। তাই বলে এমন ভাবও দেখিও না যেন সীতা বলে কেউ ছিল তুমি তা স্রেফ ভুলে গেছ---মাসীমা তা'হলে ভাববেন একটা খেলা করছি আমরা ওঁর সঙ্গে।

হেমন্ত সংশয় ভরে বলে, ওটা কি মার সঙ্গে ছলনা করা হবে না সীতা?

সীতা জোর দিয়ে বলে, না। কারণ, আমরা স্বাভাবিক ভাবে মেলা মেশা করলেও মাসীমা সেটাকে এখন বিকৃত দৃষ্টিতে বিচার করবেন, খুঁজে খুঁজে শুধু বার করবার চেষ্টা করবেন আমার জন্য ওঁকে কিসে তুমি অবহেলা করলে, কিসে তুচ্ছ করলে। ওঁর বিকারটাই তাতে জোরালো হবে। শান্ত মনে ভাববার বুঝবার সময় পেলে উনি এ দুর্ব্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। মা অসুস্থ, কিছু দিন তুমি তাঁর চিকিৎসা করবে। এতে ছলনার কি আছে?

হেমন্ত চুপ করে ভাবে। তার মুখে মৃদু হতাশা ও অসহায়তার ভাব ফুটে উঠতে দেখে দুঃখের সঙ্গে সীতা ভাবে, তাকে ছেড়ে দূরে দূরে কি করে থাকবে তাই কল্পনা করতে আরম্ভ করেছে

কি হেমন্ত নিজের মধ্যে গভীর বেদনা জাগাতে? হেমন্ত কথা কইতে সে স্বস্তি পায়। অত হাল্কা নয় হেমন্ত।

এই সময়টাতেই তোমাকে আমার বেশী দরকার ছিল।

না হেমন্ত, বিনা দ্বিধায় সীতা বলে, এটা তোমার ভুল। আমি সব সময় পেছনে লেগে না থাকলে যদি তুমি ভেঙ্গে যাও, তবে তাই যাওয়াই ভাল। কিন্তু তা সত্যি নয়, ভেবো না। তোমার নতুন বিশ্বাস শিথিল হবে না, মনের জোরে ঘাটতি পড়বে না। এমন অনেককে পাবে, যারা বরং ওদিক দিয়ে আমার চেয়ে বেশী কাজে লাগবে তোমার এ সময়। তা ছাড়া, সীতা স্নিগ্ধ হাসি হাসে, আমাকে একেবারে ত্যাগ করতে তো বলিনি তোমায়।

জয়ন্তের মনে শুধু এই ভয়, বাড়ী ফিরলে মা বকবে। আর সব ভয়-ডর সে ভুলে গেছে। সে আর তার দশ বার জন সঙ্গী আজ পৃথিবী জয় করতে পারে। পাড়ার এই ছেলেদের সঙ্গে কত রকম খেলা সে খেলেছে, কত অ্যাডভেন্‌চার করেছে রায় বাবুদের বাড়ীর সামনের লোহার গেট ও প্রাচীর-ঘেরা ছোট্ট বাগানের ফুল চুরি করা থেকে বগলস খুলে ডিকসনের কুকুরটাকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া পর্য্যন্ত, বারো বছর বয়সের জীবনে আজকের মত এমন উত্তেজনা এমন উন্মাদনা আর কোন দিন সে পায়নি। এদিক ওদিক একটু ঘুরে দেখে

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাবে বলেই সে বেরিয়েছিল, শিশির, মনা, অশোকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু বেলা দুপুর হয়ে এল, এখনো তারা ফিরতে পারেনি। বড় মোড়ে মিলিটারী লরীটাতে আগুন ধরামাত্র ওখানে ছুটে গিয়েছিল দল বেঁধে দেখতে, তারপর চারটে লরী পোড়ানো দেখে এতক্ষণে তারা পাড়ার গলির মোড়ে ফিরে এসেছে। তার আগে কি ফেরা যায়? বাড়ীতে নয় একটু বকবেই। হাজার হাজার লোকে যখন রাস্তায় নেমে এসেছে, একটি গাড়ী পর্য্যন্ত চলতে দেবে না পণ করে, সে কি করে বাড়ী ফেরে।

শিশির জিজ্ঞেস করেছিল, কেন গাড়ী চলবে না ভাই?

জয়ন্ত—তের বছরের জয়ন্ত, ন' বছরের ছেলের প্রশ্নে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল, জানিস না? গুলি করবে কেন? এটা আমাদের দেশ, আমরা যা খুসী করব। ওরা গুলি করবে কেন?

অশোক বলেছিল, তাছাড়া, আমাদের স্বাধীনতা চাই তো। পরাধীন হয়ে থাকব কেন শুনি?

মনা সায় দিয়েছিল, বাবা বলে, আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি, তাই স্বাধীনতা পাই না। আমরা তাই এক হয়েছি। দেখছিস না? এই দ্যাখ।

বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার জন্য শান্তি বাহিনীর একটি গাড়ী তিন দলের পতাকা উড়িয়ে মোড়ের মাথায় থেমেছিল, লাউড স্পীকার থেকে ভেসে এসেছিল : সংযম হারালে, দু'চার-

খানা গাড়ী পোড়ালে, অন্যায়ের প্রতিকার হবে না, স্বাধীনতা আসবে না। শান্ত হয়ে সকলে বাড়ী ফিরে যান, কিম্বা প্রতিবাদ সভায় যোগ দিন। সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনে দাবী আদায় করুন।

জয়ন্ত বলেছিল, তোকে বলিনি ঢিল ছুড়িস না মনা? শুনলি তো।

তারপর তারা ফিরে এসেছে এই গলির মোড়ে। গলা শুকিয়ে গেছে তাদের 'ইনক্লাব, জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম' চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা চেঁচিয়েছে, তারা তো তুচ্ছ নয়। খিদেয় অবসন্ন হয়ে এসেছে শরীর। তবু গলির ভেতরে ঢুকে যে যার বাড়ী চলে যাবে সে ক্ষমতা যেন পাচ্ছে না তারা। তাদের শিশু-মনের স্বপ্ন, আর রূপকথা যেন বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে আজ তাদের সামনে সহরের রাজপথে, অফুরন্ত সুযোগ জুটেছে রাজপুত্রের মত বীরত্ব দেখাবার।

এ মোড়ের অল্প দূরে একটা লরী পুড়ছিল। তাই দেখার জন্য তারা দাঁড়িয়ে থাকে। সৈন্য-বোঝাই একটি লরী আসছে দেখা যায়, শব্দও পেঁাছায় এখানে।

জয়ন্ত বলে দৃঢ়স্বরে, সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডারের মত, এই শেষবার। এদের শুনিয়ে দিয়ে আমরা বাড়ী ফিরব। আমি যা বলব, তোমরা ঠিক তাই বলবে। দু'-তিন পা এগিয়ে দাঁড়াই চলো। রেডি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম। ইনক্লাব—

মনার গায়ে ঢলে জয়ন্ত রাস্তায় আছড়ে পড়ে। উঠবার যেন চেষ্টা করছে এমনি করে নেড়েচেড়ে কয়েক বার। দু'বার কাসে রক্ত তুলে। তারপর নিস্পন্দ হয়ে যায়। তেরটি শিশু তাকে ধরাধরি করে গলির ভেতরে নিয়ে গিয়ে বাড়ীর সামনের প্রথম যে বারান্দা মেলে তাতে শুইয়ে দেয়।

অনুরূপা তখন ধৈর্য্য হারিয়ে ছেলের খোঁজে গলি দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন।

সাড়ে আটটা বাজে, অজয় এখনো স্নান করতে গেল না। বাড়ীর সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেই যে কথা আরম্ভ করেছিল, সুধীর আর নিরঞ্জনের সঙ্গে বাজার থেকে ফিরে, এখনো মসগুল হয়ে কথাই বলে চলেছে। যেন ভুলে গিয়েছে যে দশটায় ওর আপিস, বাড়ী থেকে বেরিয়ে আপিসে পেঁছিতে এক ঘণ্টার কম লাগে না। হাওড়া ব্রিজ পর্য্যন্ত হেঁটে না গিয়ে আজ ট্রামে বাসে যাবে যদি ভেবে থাকে, তা ও ভাবুক, কারো তাতে কিছু বলার নেই, মাঝে মাঝে দু'একদিন এইটুকু পথ হাঁটার বদলে সখ করে মিছিমিছি ট্রামে বাসে কটা পয়সা বাজে খরচ যদি করতে চায় কেউ তাতে কিছু মনে করে না। কিন্তু এখন স্নান করতে না গেলে ট্রামে বাসে পয়সা নষ্ট করেও যে আপিসে লেট হয়ে যাবে সেটা তো খেয়াল থাকা দরকার ওর।

মৃদু অস্বস্তি বোধ করে বাড়ীর লোক, মাধু ছাড়া। ওদের সঙ্গে এত কথাই বা কিসের সবাই ভাবে, মাধু ছাড়া। ক্লাশ-ফ্রেণ্ড ছিল বটে, এখন তো আর নয়। ওরা কলেজে পড়ছে, অজয় চাকরী করছে। এত ভাব ওদের সঙ্গে এখন না রাখাই উচিত।

অনন্ত সইতে না পেরে মেয়েকে বলে, মাধু, [illegible] একবার ডাক।

এই তো ডাকলাম।

আবার ডাক। কটা বাজল? আটটা পঁয়ত্রিশ। ডেকে বল 'পৌনে নটা হয়ে গেছে।'

বলেছি তো একবার। দাদার কি সে হিসেব নেই ভাব? অত খোঁচানো ভালো নয়। মাধু শান্ত গলাতে বলে। আশ্চর্য্য রকম সে শান্ত হয়ে গেছে আজকাল। সে রকম এলোমেলো মেজাজ আর নেই, একের পর একটা বিয়ের চেষ্টা ফসকে যাবার ক'বছর যেমন ছিল। সে যেন ওদিকের সব আশা ভরসা মুচড়ে ফেলে হাল ছেড়ে দিয়ে সুস্থ হয়েছে।

কপালে চাপড় মেরে অনন্ত বলে, তুই আর আমাকে উপদেশ দিসনে মাধু, দিসনে। গলায় দড়ি [illegible] না তোর?

দাওনা জুটিয়ে? মাধু হেসে বলে, দড়ি কিনতেও পয়সা লাগে বাবা। এক ঘণ্টা ধরে চুল ঘষে দিলাম, দত্তবাড়ীর বৌটা পয়সা দিলে চার আনা। [illegible]র আনায় গলায় দেবার দড়ি হয় না। রোজগার বাড়ুক, দড়িও জুটিয়ে নেব।

অনন্ত কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় মেয়ের দিকে।

তার তাক লেগে যায় নিজের ছেলেমেয়েগুলির রকম দেখে। এত যে তার দুঃখ দুর্দ্দশার সংসার, শুধু শুধু অশান্তি আর হতাশা, ওরা কেউ যেন তার অস্তিত্ব মান[illegible] না প্রতিজ্ঞা করেছে। লড়াই থামতে না থামতে তাকে বুড়ো বয়সে খেদিয়ে দিল চাকরী থেকে, পড়া ছেড়ে চাকরী নিয়ে দুটো পয়সা

আনছে ছেলেটা তাই আধপেটার হাঁড়িটা চড়ছে কোনমতে, যে কাপড় পরে আছে মাধু ওর দিকে তাকান যায় না, অজয় যে বেশে আপিস যায় যেন কুলি চাষীর ছেলে, আজ বাদে কাল কি হবে ভেবে বুকের রক্ত তার হিম হয়ে আছে, কিন্তু ওরা যেন গ্রাহ্যই করে না কোন কিছু ! আগে যখন আরও সহজে সংসার চলত, অজয়ের পড়া চালানো, মাধুর বিয়ে দেওয়া, এসব ব্যবস্থা একরকম করে করা যাবে মনে বেঁচে এ ভরসা করা চলত, তখন যেন কেমন হতাশ, মনমরা ছিল সকলে, রাগারাগি চুলোচুলি কাঁদাকাটা অশান্তি লেগেই ছিল ঘরে---এখন আরও শোচনীয় অবস্থায় এসে ভবিষ্যতের সব আশা-ভরসা হারিয়ে আধপেটা খেয়ে ছেঁড়া কাপড় জামায় দিন চালিয়ে গিয়েও সবাই যেন জীবন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে---ভয় নেই ভাবনা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা সব ঠিক করে নেব, এই ভাব সকলের। মায়ের গঞ্জনায় মাধু একদিন মরতে গিয়েছিল ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে, অজয় গিয়ে সময়মত না ধরলে সর্ব্বনাশ হয়ে যেত। এখনো গলায় সে দাগ আছে মাধুর। আজকাল গালাগাল গঞ্জনা উপহাস কিছুই সে গায়ে মাখে না। রাগ তো করেই না, হেসে উড়িয়ে দেয় !

অথচ আজ ওর গায়ে আঁটা আছে এই সত্যটা যে কাপড় ও পরে আছে, ওর দিকে তাকানো যায় না।

অনন্ত ঝিমোয়। তার সাধ যায় ছেলেমেয়ের কাছে হার মেনে মাপ চেয়ে বলতে যে এই ভাল! এই ভাল।

কিন্তু সে চমকে উঠে গর্জেই বলে, অজয়। আপিস যেতে হবে না আজ? আড্ডা দিলেই চলবে সারাদিন?

অজয় ভেতরে এসে বলে, আজ আপিস যাব না বাবা। আজ সব আপিস কারখানায় হরতাল। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

অনন্ত সোজা হয়ে বসে উদ্বেগে, আতঙ্কে, উত্তেজনায়। জোর দিয়ে বলে, শীগগির যা, না খেয়ে চলে যা আপিসে। কিনে খাস কিছু খিদে পেলে। হেঁটে চলে যা, দেরী হলে কিছু হবে না। অন্য দিন কামাই করিস যায় আসে না, আজ আপিসে যেতেই হবে। গিয়ে ম্যানেজার সায়েবকে বলবি, ট্রাম বাস বন্ধ, হেঁটে আসতে হল বলে দেরী হয়েছে। বলবি, কয়েক জন জোর করে তোকে আটকে রাখতে চেষ্টা করেছিল, তুই অনেক কষ্টে কারো কথা না শুনে আপিসে এসেছিস—

অনন্ত কাসতে সুরু করে। কাসতে কাসতে বেদম হয়ে পড়ে। তবু তারই মধ্যে কোনমতে বলে, সায়েব খুসী হবে, মাইনে বাড়বে, উন্নতি হবে, আপিস যা।

কাসি থামলে গুটলি মুটলি পাকিয়ে মরার মত পড়ে থাকে অনন্ত।

মাধু হাওয়া করে, অজয় বুকে পিঠে হাত ঘষে দেয়। গোলমাল শুনে নিরঞ্জন ভেতরে এসেছিল, মাথা হেঁট করে সে দাঁড়িয়ে থাকে, চোখ তোলে না। ছেঁড়া কাপড়ে অনেক যত্নে মাধু যখন নিজেকে মোটামুটি ঢেকে রাখে, তখনও তার দিকে চাওয়া যায় না। এখন সে ব্যাকুল হয়ে নিজের কথা ভুলেই গেছে।

আধ ঘণ্টা পরে একটু সুস্থ হয়ে অনন্ত ডাকে, অজয়?

বাবা?

আজ আপিস যেও না। সবাই যখন আপিস যাচ্ছে না, তোমার যাওয়া উচিত হবে না। সবাই যা করে, তাই করাই ভাল।

নিরুদা, যেওনা। কথা আছে। মাধু তার বাইরে বেরোবার আস্ত শাড়ীখানা পরে আসতে যায়।

আপনার একটা ওষুধ খাওয়া দরকার কাসির জন্য। নিরঞ্জন বলে।

দরকার তো অনেক কিছুই বাবা। সব দরকার কি মেটে। ক্ষোভের সঙ্গে বলে অনন্ত।

পাল ডাক্তারকে কতবার ডাকতে চেয়েছি, আপনিই বারণ করেন। অজয় মৃদুস্বরে বলে। অনন্তের মন্তব্যের বিরুদ্ধে অভিমানের নালিশ জানাতে নয়, বাপকে সান্ত্বনা দিতে। অনন্ত নিজেকে সংশোধন করে বলে, ডাকবার দরকার কি?

আমি যেতে পারি না? ডাক্তারি ওষুধ আমার সয় না।

একখানা মাত্র সম্বল শাড়ীখানা পরে এসে মাধু বলে নিরঞ্জনকে, ঘোষেদের বাড়ীতে পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছিলে, আজ নিয়ে চলো। কাল থেকেই কাজ করব, চায় তো ওবেলা থেকেই। কিন্তু ভাবছি কি, মাধু মৃদু সংশয়ের হাসি হাসে, আমার রান্না কি রুচবে ওদের, এত বড়লোক মানুষ।

অনন্ত অপলক চোখে চেয়ে থাকেন। তার মত নেই, তিনি বারণ করেছেন, তবু তাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত না করে তারই সামনে দাঁড়িয়ে মেয়ে তার অনায়াসে লোকের বাড়ী রাঁধুনির কাজে ভর্ত্তি করিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করছে দাদার বন্ধুকে। লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, অপমান বোধ নেই। অজয় চোখ পেতে রাখে মেঝেতে। লাল সিমেণ্টের মেঝে দু'বেলা মুছে মুছে তেল চকচকে করে তুলেছে মাধু। মাধু ঝি হোক রাঁধুনি হোক এতে তার লজ্জা নেই। সে থাকতে ওকে রাঁধুনি হতে হয় এমন সে নিরুপায়, এই ক্ষোভে কাণ দুটি তার ঝাঁ ঝাঁ করে।

আজ তো হবে না মাধু।

রাঁধুনিদের কাজে যাওয়াও বারণ নাকি আজ?

নিরঞ্জন হাসে।--আমরা এখুনি বেরিয়ে যাব। আজ কি নিশ্বাস ফেলার সময় আছে? দশটায় এখানে একটা

মিটিং আছে, তারপর বড় মিটিং, তাছাড়া আরও কত কাজ।

তোমরা মানে? দাদাও যাচ্ছ নাকি? চলো তবে আমিও বেরোই তোমাদের সঙ্গে। একটু দেখে শুনে আসি।

মাধুর চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে।—বাড়ীতে মন টিঁক্‌ছে না আজ। খালি মনে হচ্ছে কোথায় যাই, কি করি।

বাঃ, তবে আর ভাবনা কি? লালদীঘি চারকোণা তো, পূবে দুটো কোণ আছে। পূব-উত্তর কোণে একটা, পূব-দক্ষিণ কোণে একটা। যে কোন কোণ থেকে পূবের রাস্তা ধরে এগোবে বুঝলে?

যাদব মাথা নাড়ে।

কেন, বুঝলে না কেন? দু'কোণ থেকে দুটো রাস্তাই পূবে গেছে, দশটা নয়। লালবাজারের সামনে দিয়ে গেলে বৌবাজারের মোড় হয়ে ডাইনে বাঁকবে, মিশন রো হয়ে গেলে ট্রাম-রাস্তা পার হবে, তারপর একজন কাউকে জিজ্ঞেস করলেই---

যাদব নীরবে পোষ্টকার্ডটি ফিরিয়ে নেয়।

অজয় এবার গম্ভীর মুখে বলে, তবে আমার সঙ্গে এসো। আমিও লালদীঘি যাচ্ছি। কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে যাব আমি। অন্য রাস্তা নেই। সঙ্গে এসে মেয়েছেলে নিয়ে মুস্কিলে পড়তে পার। বুঝে দ্যাখো।

রাণী বলে, চলুন যাই।

জোরে জোরে হেঁটে সে এগিয়ে যায়। লাল গোঁপের কাছ দিয়েই হাঁটতে থাকে। এবার কিন্তু লাল গোঁপ তাকিয়েই থাকে শুধু। খানিক দূরে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় যাদবদের জন্য. অজয় থেমে দাঁড়ায়। আবার এগোয়, আবার থামে। তার বিরক্তিভরা মুখ দেখে যাদব অস্বস্তি বোধ করে। তবে

জাল পেতে বোকা হাবা গেঁয়ো লোক ধরা সহুরে বেদে এ ছোকরা নয়, এটা সে বিশ্বাস করে অনায়াসে।

একবার বলে যাদব কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষায়, মোদের তরে মিছিমিছি হাঁটতে হল বাবু আপনাকে।

না বাবু হাঁটতে আমাকে হতই, একটু বেশী হাঁটা হচ্ছে। কি করি বল, তোমরা তো নাছোড়বান্দা।

জেটি শেড ডাইনে রেখে তারা সোজা এগোতে থাকে। চারি দিকে কর্ম্মহীন স্তব্ধতা, উগ্র প্রতীক্ষার মত। শেডের ফাঁক দিয়ে রাণী মস্ত চোঙাওলা বিদেশী জাহাজের দিকে তাকায় মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে, ভাল করে না দেখতে দেখতে আড়াল হয়ে যায় সেগুলি।

'বিদ্যুৎ লিমিটেড' খুঁজে পাওয়া যায় সহজই---এতখানি রাস্তা হেঁটে গিয়ে খুঁজে বার করার কষ্টটা ছাড়া। কিন্তু দোকান বন্ধ দেখে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। যাদব বলে, কি সব্বোনাশ!

অজয় রাগ করে বলে, তোমার ঠিকানা ভুল হয়েছে। যা খুসী করো তোমরা, আমি চল্লাম।

সে অবশ্য যায় না। শোভাযাত্রায় যোগ দিতে মনটা যতই ছটফট করুক, এ বেচারীদের একটা হিল্লে না করে ফেলে যাওয়া যায় কেমন করে। যাদবের কাছ থেকে গণেশের চিঠি-খানা চেয়ে নিয়ে আরেকবার সে ঠিকানা মিলিয়ে দ্যাখে। ঠিকানা ঠিক আছে। এই দোকানেই গণেশ কাজ করে। এখন

দোকানের মালিকের বাড়ীর ঠিকানা খুঁজে বার করতে হবে। তার কাছে যদি গণেশের খোঁজ মেলে।

অত বড় আঁকা-বাঁকা হরফে লেখা চিঠিখানা পড়ে অজানা গণেশকে ভাল লেগেছিল অজয়ের। চিঠির প্রতি ছত্রে অশুদ্ধ গ্রাম্য কথাগুলিতে ফুটে উঠেছে মা-বাপ-ভাই-বোনের জন্য গণেশের মমতা, ওদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য শহরে তার প্রাণপণ লড়ায়ের ইঙ্গিত: কত যে ভরসা দেওয়া আছে চিঠিতে আর তাতেই ধরা পড়ছে অতি কঠিন অবস্থাতেও গণেশের তেজ আর আত্মবিশ্বাস। কিন্তু গণেশের বুদ্ধি বড় কম। যে দোকানে কাজ করে সেখানকার ঠিকানাটা শুধু না দিয়ে, যেখানে সে থাকে সে ঠিকানাটা তার দেওয়া উচিত ছিল।

বাড়ীর দরোয়ানকে প্রশ্ন করে তার জবাব শুনে অজয় স্বস্তি বোধ করে। গণেশের বুদ্ধির ত্রুটিটাও মাপ করে ফেলে। বিদ্যুৎ লিমিটেডের মালিক এই বাড়ীরই উপরে থাকে এবং গণেশও তার কাছেই থাকে এ খবর জেনে যাদবেরাও নিশ্চিন্ত হয়।

রাণী বলে খুসী হয়ে, মা গো! ভড়কে গিয়েছিলাম একেবারে! বাঁচা গেল।

অজয় বলে, আমি তবে যাই এবার?

যাদব গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলে, হ্যাঁ বাবু, আপনি এবার আসুন। অনেক করলেন মোদের জন্য।

সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে তার কৃতজ্ঞতাকে গ্রহণ করে অজয় নীরবে বিদায় হয়ে যায়।

যাদব আবেদন জানায় দরোয়ানকে, গণেশকে একবার ডেকে দেবেন দরোয়ানজী?

দরোয়ানজী উদাস ভাবে বলে, ও হ্যায় কি বাহার গিয়া মালুম নেই। যাও না, উপর চলা যাও না?

গণেশের বাড়ীর লোক তার খোঁজ করতে এসেছে শুনে দাশগুপ্ত বিরক্ত হয়ে নিজেই উঠে আসে। গণেশের কথা কি বলবে মনে মনে তার ঠিক করাই আছে। দোকানের জিনিষ নিয়ে গণেশ পালিয়েছে, সে চোর। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, গণেশকে একবার ধরতে পারলে জেল খাটিয়ে ছাড়বে। এ-সব বলে ভড়কে দিতে হবে ওদের, যাতে কোন রকম হাঙ্গামা করতে সাহস না পায়। দাশগুপ্তের অবশ্য ভয়-ভাবনার কিছু আর নেই, তবু সামান্য হাঙ্গামাও সে পোয়াতে চায় না গণেশের বোকার মত গুলি খেয়ে মরার ব্যাপার নিয়ে। এমনিতেই সর্বদা তাকে কত ঝনঝাট নিয়ে থাকতে হয়। তার ওপর আবার গণেশের সম্বন্ধে খোঁজখবর-তদন্তের জন্য দশটা মিনিট সময় দিতে হবে ভাবলেও তার বিরক্তি বোধ হয়।

ফ্ল্যাটের সদর দরজার ঠিক সামনে ঘেঁষাঘেঁষি করে তারা দাঁড়িয়েছিল। ভাইকে কাঁখে নিয়ে রাণী দাঁড়িয়েছে বাঁকা ও পরিস্ফুট হয়ে। তার দিকে নজর পড়তেই দাশগুপ্তের

চোখ পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত তাকে কয়েকবার দেখে নেয়, রাণীর মুখে যে মৃদু বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে তাও তার চোখে ধরা পড়ে। চিন্তাধারা সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে সুরু করে দাশগুপ্তের। তাই, গোড়াতেই প্রেষ্টিজ হারাতে না চেয়ে সে ইচ্ছে করে মস্ত হাই তুলে মুখ-চোখের ভাব বদলে নির্বিকার গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে তোলে।

গণেশকে খুঁজতে এসেছো ?

যাদব বলে, আজ্ঞা হ্যাঁ। আছে না গণেশ ?

এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে দাশগুপ্ত বলে, তুমি কে গণেশের ?

গণেশ চুরি করে পালিয়েছে বলে ওদের ভড়কে দিলে চলবে না, অন্য কিছু বলতে হবে। সাগসই কি বলা যায় দাশগুপ্ত ভাবতে থাকে।

গণেশ আমার ছেলে বাবু। দেশ গাঁ থেকে আসছি আমরা।

ও। দাশগুপ্ত বলে উদাস ভাবে, এখন তো গণেশ এখানে নেই।

কখন ফিরবে বাবু ?

গণেশ কি জানো, ছুটি নিয়ে গেছে ক'দিনের। কোথায় যেন যাবে বলল, নামটা মনে পড়ছে না। কারা সব সঙ্গী জুটেছে, তাদের সঙ্গে গেছে। তিন-চার দিনের মধ্যেই ফিরবে।

হাসপাতালে অথবা মর্গে যার মৃত-দেহটায় হয়তো এখন পচন ধরেছে, অনায়াসে দাশগুপ্ত তার বাপ-মা-ভাইবোনদের জানায় সে ফিরে আসবে তিন চার দিনের মধ্যে, এতটুকু বাধে

না। তার ভাব-ভঙ্গিটা শুধু রাণীর কাছে একটু কেমন কেমন লাগে।

তবে তো মুস্কিল। আমরা এখন যাই কোথা! যাদব বলে হতাশ হয়ে।

কোন খবর না দিয়ে কিছু ঠিক না করে এ ভাবে এলে কেন বোকার মত?

দাশগুপ্ত বলে রাগ আর বিরক্তি দেখিয়ে, কয়েক মুহূর্ত্ত ভাববার ভাণ করে, তার পর যেন অনিচ্ছার সঙ্গে বলে, এইখানেই থাকো এখনকার মত, কি আর করা যাবে।

বলে সংযম হারিয়ে রাণীর ওপর একবার নজর না দিয়ে পারে না।

রাণী বলে, বাবা, বদ্যি মশায়ের ছেলে তো আছেন। তাঁর কাছে গেলে সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

যাদব ইতস্ততঃ করে। কেশব বদ্যির ছেলে থাকে হাওড়ায়, আবার সেখানে ছুটবে এত পথ হেঁটে! গিয়ে যদি তাকেও না পাওয়া যায়, কি উপায় হবে তখন!

দাশগুপ্ত বলে, কোথায় যাবে আবার, এখানেই থাকো। একটা ঘর ছেড়ে দিচ্ছি তোমাদের।

রাণী বলে, বাবা, শোন।

যাদব কাছে এলে চুপি চুপি বলে, না বাবা, এখানে থাকা চলবে না। বাবু লোক ভাল না। মোর ভরসা

হচ্ছে না মোটে। শেষকালে গোলমাল হবে, চাকরীটা যাবে দাদার?

যাদব তখন বলে দাশগুপ্তকে 'আজ্ঞে, দেশের এক ভদ্দর লোক পত্র দিয়েছেন, আমরা তার ছেলের ওখানেই যাই। আপনার এখানে হাঙ্গামা করব না বাবু।'

যা খুসী তোমাদের। দাশগুপ্ত বলে।

সময়টা তার খারাপ পড়েছে সত্যি দাশগুপ্ত ভাবে।

ধীরে ধীরে আবার তারা পথে নেমে যায়। আবার দীর্ঘ পথ হাঁটিতে হবে। ষ্টেশন থেকে এত দূর হেঁটে এসেছে, এবার ষ্টেশন পার হয়ে অনেক দূরে যেতে হবে। যে পথে এসেছিল সেই পথেই আবার তারা লালদীঘির দিকে চলতে আরম্ভ করে।

গণেশের মা বলে, ছুটি নিয়ে কোথায় বেড়াতে গেল গণেশ? মোদের জানালো না কিছু চিঠিতে, কিছু বুঝি না বাবু ব্যাপার-স্যাপার।

সহরে এসে স্যাঙাৎ জুটেছে ছেলের। যাদব বলে ঝাঁঝের সঙ্গে।

অমন কথা বলো না গণশার নামে। সে আমার তেমন ছেলে নয়।

লালদীঘির দিকে বাঁক ঘুরবার মোড়ের কাছাকাছি এলে দূরাগত জনতার কলরব তাদের কানে ভেসে আসে।

লালদীঘির সামনা-সামনি পৌঁছে তাদের থামতে হয়। চারিদিক লোকারণ্য, ভিড় ঠেলে এগোনো অসম্ভব। বিরাট এক শোভাযাত্রার মাথা লালদীঘির ওদিকের মোড় ঘুরছে, সামনে তিনটি তিন রকম বড় পতাকা উত্তুরে হাওয়ায় পত পত করে উড়ছে। শোভাযাত্রার শেষ এখনো দেখা যায় না। ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনি উঠছে হাজার কণ্ঠে। এবার যাদবের মনে হয়, বাঘ যেন ডাক দিচ্ছে মনের আনন্দে।

সামনে তারা দেখতে পায় অজয়কে।

মানুষ ঠেলে তারা অজয়ের কাছে যায়। যাদব ডাকে, বাবু!

অজয় ফিরে তাকায় না। যাদব শুনতে পায় সে নিজের মনে বলছে: আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারেনি, আমরা এগিয়েছি।

ঘাড় উঁচু হয়ে গেছে অজয়ের, দু'টি চোখ জ্বল জ্বল করছে আনন্দে, উত্তেজনায়। যাদব চেয়ে দ্যাখে, সে হাসছে। মুখে যেন তার সূর্য্য উঠেছে মেঘ কেটে গিয়ে।

সমাপ্ত